ভয়ংকর ভুতুড়ে

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. আখলাক সাহেব থাকেন কলাবাগানে 2
২. গম্ভীর ধরনের মানুষ 17
৩. সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল 35
৪. আখলাক সাহেব রাত ঠিক নটায় ভাত খান 42
৫. আখলাক সাহেব একটা রুটিনের মতো করেছেন 46
৬. আখলাক সাহেব বাড়ি ফিরলেন 62
৭. সাইকিয়াট্রিস্টের নাম জয়েনউদ্দিন 69
৮. আখলাক সাহেবের বিয়ে হলো 87

১. আখলাক সাহেব থাকেন কলাবাগানে

আখলাক সাহেব থাকেন কলাবাগানে। অনেকখানি ভেতরের দিকে। দেয়ালঘেরা তিন কামরার একতলা একটা বাড়ি। আশেপাশে ছয়-সাততলা বিশাল বাড়ি ঘর উঠে গেছে। সেখানে এরকম ছোট একটা বাড়ি মাঝে মাঝে তার লজ্জাই লাগে। বাড়ি ভেঙে বড় বাড়ি করার মতো টাকা পয়সা তাঁর নেই। ইচ্ছাও নেই। বড় বাড়ি দিয়ে কী করবেন? তিনি একা মানুষ। একজন মানুষের ঘুমাবার জন্যে তো আর পাঁচটা কামরা লাগে না। একটা কামরাই যথেষ্ট। তিনি বাড়ির চারদিকে গাছপালা লাগিয়েছেন। গাছগুলি চোখের সামনে বড় হচ্ছে। দেখতে তাঁর ভালো লাগে। গত বর্ষায় কাকরুল গাছ লাগালেন–কেঁপে কাকরুল হলো। এতেই তিনি খুশি। তিনি খুব শান্তিতে আছেন।

কিছুদিন হলো তাঁর মনের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। তাঁর বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়েছে। যে জিনিস তিনি বিশ্বাস করেন না, সেই জিনিস তার ঘরে। ভয় তিনি পাচ্ছেন না। যা পাচ্ছেন তার নাম লজ্জা। এত কিছু থাকতে তাঁর বাড়িতে কিনা ভূতের উপদ্রব। ব্যাপারটা কাউকে বলতেও পারছেন না। যাকে বলবেন সে-ই মুখ বাঁকিয়ে হাসবে। হাসারই কথা। অন্য কেউ তাঁকে ভূতেব কথা বললে তিনিও হাসতেন। হাসাটাই স্বাভাবিক।

উপদ্রবটা গত চাবদিন ধবে চলছে। প্রথম দিনের ঘটনাটা এরকম–রাত এগারোটা, তিনি মশাবি থাটিয়ে বাতি নিভিয়ে বিছানায় এসে শুয়েছেন, ওমি বাতি আপনা। আপনি জ্বলে উঠল। তিনি অন্য দশ জনের মতো ভাবলেন সুইচে কোনো গণ্ডগোল। দেশী সুইচগুলি কোনো কাজেব না। কিছু না কিছু গণ্ডগোল থাকবেই। মানুষ যে শুধু বিদেশী জিনিস খোঁজ কবে–এই জন্যেই করে। তিনি আবার উঠে গিয়ে বাতি নেভালেন। বিছানায় এসে শুলেন।

শীত শীত লাগিছিল, চাদরটা গায়ে টেনে দিলেন, ওমি আবারো বাতি জ্বলে উঠল। তিনি চাদর ফেলে দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন, তখন একবার মনে হলো ভূতের উপদ্রব না তো? এরকম হাস্যকব একটা কথা তার মনে এসেছে–এই ভেবে তিনি নিজেই নিজের উপর অত্যন্ত বিবক্ত হলেন। বোঝাই যাচ্ছে সুইচে গণ্ডগোল। প্রিং ট্রিং কেটে গেছে কিংবা কোনো স্কু টাইট হয়ে গেছে। একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে এনে দেখাতে হবে। আখলাক সাহেব বুঝতে পারছেন না। আবার বাতি নেভাবেন কিনা। লাভ কী, নিভালেই হয়তো আবার জ্বলে উঠবে। এবচে বাতি জ্বলাই থাকুক। তিনি আবার শুয়ে পড়লেন, তখন বাতি আপনাআপনি নিভে গেল। তিনি ডাকলেন, মোতালেব মোতালেব।

মোতালেব তার কাজের ছেলে। পাশের ঘরে সে ঘুমুচ্ছে। সামান্য ডাকে তার ঘুম ভাঙবে এরকম মনে করার কোনোই কারণ নেই। তার দশ গজের ভেতর মাঝারি সাইজের কোনো এটম বোমা ফাটলে ঘুম ভাঙলেও ভাঙতে পারে। এই সাধারণ তথ্য জেনেও আখলাক সাহেব মোতালেবকে কেন ডাকলেন নিজেই বুঝতে পারছেন না। তিনি কি ভয় পাচ্ছেন? ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি কি না ভূতের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর কাজের ছেলেকে ডাকছেন! ভাগ্যিস ব্যাপারটা আর কেউ শুনে ফেলে নি। কোনোদিন কারো সঙ্গে আলোচনা করাও ঠিক হবে না। বাহান্ন বছরের একজন মানুষ ভূতের ভয়ে তার কাজের ছেলেকে ডাকাডাকি করছে–কোনো মানে হয়?

আখলাক সাহেব শুয়ে পড়লেন। মনস্থির করে শোয়া। বাতি জ্বলতে থাকুক নিভৃতে থাকুক। তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন। তাঁকে সকালে উঠতে হবে। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সকাল আটটায় ক্লাস। তিনি তাদের কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি পড়ান। কাল তাকে সার্কেলের ইকোয়েশন বুঝাতে হবে। নতুন চ্যাপ্টার। সকাল সকাল উঠতে না পারলে ক্লাস মিস হয়ে

যাবে। ছাত্ররা ক্লাস মিস করতে পারে, শিক্ষকরা পারে না। তাঁর ঘুমের কোনো সমস্যা নেই। বিছানায় যাওয়া মাত্র তিনি ঘুমাতে পারেন। আজ ঘুম চটে গেছে। তিনি একাত থেকে ওকাত হলেন। তাঁর খানিকটা পিপাসাও পেল। পানি খাওয়ার জন্যে এখন উঠলে ঘুম পুরোপুরি চটে যাবে। কাজেই তিনি পিপাসা নিয়েই চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। তাঁর মনে হলো বালিশে কোনো সমস্যা। বালিশটা আরেকটু উঁচু হলে ভালো ছিল। তিনি বালিশ উল্টে দিলেন আর তখন শুনলেন তার মশারির কাছে এসে কে যেন কাশল। একবার দুবাব। দৃষ্টি আকর্ষণ করা জাতীয় কাশি। কে কাশবে তার মশারির কাছে?

স্যার কি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

কে?

স্যার আমি।

আমিটা কে?

আমাকে স্যার চিনবেন না। আমি জনৈক বিপদগ্রস্ত ভুত। গভীব বাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আন্তরিক লজ্জিত। ক্ষমাপ্রার্থী! স্যার, দযা কবে নিজ গুণে ক্ষমা কববেন। ক্ষমা মানব ধর্ম।

আখলাক সাহেব ধরেই নিলেন তিনি ব্যাপারটা স্বপ্নে দেখছেন। ভূতেব ভযা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন বলেই ভৌতিক স্বপ্ন। আর কিছুই না। ভূত বিশ্বাস না কবলেও স্বপ্নে ভূতেব সঙ্গে

কথা বলা যায়। তাতে অস্বস্তি বা লজ্জা বোধ করার কিছু নেই। এখন তার একটু মজাই লাগল।

তুমি তাহলে ভূত?

জি স্যার। বিপদগ্রস্ত ভূত। অপারগ হয়ে আপনার কাছে এসেছি।!

তুমিই কি বাতি জ্বালাচ্ছিলে নিভাচ্ছিলে?

ইয়েস স্যার।

ইংবেজি জানো নাকি?

সামান্য জানি স্যার। ভেরি লিটল। চর্চা নেই বলে মাঝে মাঝে ভুল হয়।

তুমি বিপদগ্রস্ত বলছিলে, বিপদটা কী?

সে এক লম্বা ইতিহাস, সময় নিয়ে বলতে হবে। স্যারেব কি সময় হবে?

না, সময় হবে না। আমাকে সকালে উঠতে হবে। সকাল আটটায় আমার একটা ক্লাস আছে। সময়মতো ঘুমাতে না পারলে ক্লাস মিস করব। আগের দুটা ক্লাস হরতালের জন্যে হয় নি।

তাহলে তো স্যার আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

অবশ্যই ঠিক হবে না।

স্যার শুভ রাত্রি।

শুভ রাত্রি।

গুড নাইট স্যার।

গুড নাইট।

স্যার গুটেন নাখাট, স্লেপেনজি গুট।

এইটা আবার কী?

জার্মান ভাষায় শুভ রাত্রি, সুনিদ্রা হোক।

তুমি জার্মান জানো নাকি?

না জানার মতোই স্যার। জার্মান কালচারাল ইন্সটিটিউটে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে যা শিখেছি। একেবারেই চর্চা নেই। বিদেশী ভাষা, চর্চা না থাকলে দুদিনেই ভুলে যেতে হয়। তাহলে যাই স্যার। কাল আবার দেখা হবে।

আচ্ছা। ভালো কথা, ঘরে ঢুকেছ কোন দিক দিয়ে?

জানালা দিয়ে ঢুকেছি। স্যার যদি অনুমতি দেন তাহলে চলে যাই।

যাও।

আখলাক সাহেবেব মনে হলো জানালার কপাট একটু নড়ল। তারপর সব চুপচাপ।

আর কোনো শব্দ হচ্ছে না। তখন আখলাক সাহেবের মনে হলো ব্যাপারটা কি আসলে স্বপ্নে ঘটেছে না। তিনি জেগেই ছিলেন, এবং এখনো জেগে আছেন? তিনি আবার ডাকলেন, মোতালেব এই মোতালেব! মোতালেব জবাব দিল না। তার জবাব দেবার কোনো কারণ নেই। একটা গদা দিয়ে মাথায় বাড়ি মারলে যদি ঘুম ভঙ্গে।

পানিব পিপাসা আবাবে হচ্ছে। স্বপ্নে কি পানির পিপাসা হয়? এইসব ভাবতে ভাবতে হয়। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, কিংবা তার স্বপ্ন দেখা শেষ হলো।

তোব ঘুম ভাঙল সকাল নটা দশ মিনিটে। ক্লাস মিস হয়ে গেল। তার অত্যন্ত মেজাজ খারাপ হলো। ভূতেব উপর রাগে গা জ্বলে গেল। ক্লাস যখন মিস হয়েই গেল তখন তিনি ঠিক করলেন আজ আর কলেজে যাবেন না। মিস্ত্রি ডাকিয়ে সুইচটা ঠিক করবেন যাতে আবাবে ভূত বিষয়ক জটিলতায় ক্লাস মিস না হয়।

নিজেই মিস্ত্রি ডেকে আনলেন। সে সুইচ বদলে বিদেশী সুইচ লাগিয়ে দিয়ে গেলজার্মান সুইচ। জার্মান সুইচের কথায় মনে পড়ল ভূতটা জার্মান ভাষায় কী কী যেন বলছিল। গুটেন নাখািট জাতীয় কিছু। কী হাস্যকর ব্যাপার। কাউকে বলা যাবে না। বিকেলে মালিবাগে তিনি তাঁর ছোট বোনের বাসায় বেড়াতে গেলেন। আত্মীয়স্বজন কারো বাসাতেই তিনি যান

না। ভালো লাগে না। একা থাকতেই ভালো লাগে। যে কারণে বিয়ে টিয়ে করেন নি। এখন মনে হচ্ছে বিয়ে করলে ভালো হতো। জার্মান জানা ভূতের গল্প নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করা যেত। একান্ত আপনজনের সঙ্গে অনেক গল্প করা যায়। তার ছোট বোন মিলি অবশ্যি তাঁর খুবই আপন। সপ্তাহে একবার তাকে না দেখতে পেলে আখলাক সাহেবের দারুণ মেজাজ খারাপ হয়। মিলির সমস্যা একটাই, দেখা হলেই বিয়ের জন্যে আখলাক সাহেবকে চেপে ধরবে। ঘ্যানঘ্যান করে মাথা খারাপ করে দেবে–ভাইয়া, তুমি একা একা কী করে থাকবে? বাহান্ন বছর বয়সে এইসব কথা শুনতে ভালো লাগে না বলে মিলির বাসায় সপ্তাহে একদিনের বেশি তিনি যান না। তাছাড়া মিলির মেয়ে তৃণা হয়েছে মহা দুষ্ট। তৃণা তাঁকে বড় বিরক্ত করে।

মিলি বাসায় ছিল না। তার স্বামীর সঙ্গে কোনো বিয়েতে নাকি গেছে। তবে তৃণা বাসায় ছিল। সে বড় মামা বলে এমন চিৎকার শুরু করল যে আখলাক সাহেবের মাথা ধরে গেল। আখলাক সাহেব মিলিকে যেমন পছন্দ করেন। তার মেয়েকে তারচে বেশি পছন্দ করেন। তবে পছন্দের ব্যাপারটা প্রকাশ করেন না। বাচ্চারা একবার যদি বুঝে ফেলে কেউ তাদের পছন্দ করছে তাহলে তার জীবন অতিষ্ঠা করে তোলে। বিশেষ করে সে বাচ্চা যদি দুষ্ট প্রকৃতির হয় তাহলে তো কথাই নেই। তাছাড়া মিলির এই মেয়ে তার মার মতোই বেশি কথা বলে। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেয়।

আখলাক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, খবর কীরে?

তৃণা হড়বড় করে বলল, বড় মামা আমার খবর ভালো। খুব ভালো। আজ তোমাকে যেতে দেব না। আজ তোমাকে আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে। সারা রাত গল্প করতে হবে। ভূতের গল্প।

আখলাক সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, অন্য কোনো গল্প করতে পারি, ভূতের ロ区 可自

উঁহু মামা, ভূতের গল্প শুনব।

ভূতের গল্প তো কিছুতেই বলব না।

বলবে না কেন?

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে ভূতের গল্প বলা যায় না। শোনাও যায় না।

শোনা যায় না কেন?

শুনলে পাপ হয়। মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে ভাইকিং নামিয়ে সয়েল টেস্টিং করছে তখন আমরা ভূত নামক কাল্পনিক প্রাণীর কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি–এটা হাস্যকর।

বড় মামা, আসলে তুমি ভূতের গল্প জানো না।

আখলাক সাহেব একবার ভাবলেন। গত রাতের অভিজ্ঞতাটাই গল্পের মতো করে বলেন। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালেন। শিশুদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া অপরাধেব মতো। তিনি ইশপের একটা গল্প শুরু করলেন।

এক ধোপার একটা গাধা ছিল। গাধাটা একদিন তার নীল মেশানো পানির গামলায় পড়ে গেল। তার গায়ের রং হয়ে গেল নীল...

তৃণা করুণ গলায় বলল, বড় মামা গাধার গল্প শুনতে ভালো লাগছে না।

তাহলে রাখাল বালকের গল্প শুনবি? এক রাখাল বালক মাঠে মেষ চড়াতো। সে ছিল দারুণ মিথ্যাবাদী। একদিন মজা করার জন্যে বলল, বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে...

তৃণা হাই তুলতে তুলতে বলল, শিক্ষামূলক গল্প শুনতে ভালো লাগছে না মামা। অসহ্য লাগছে।

আখলাক সাহেবকে বাধ্য হয়ে গত রাতের গল্পটা বলতে হলো। তবে ব্যাপারটা যে আসলে স্বপ্ন তা তিনি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। বাচ্চাদের মনে কোনো খটকা থাকা ঠিক না। তৃণা বলল, মামা আমার ধারণা আসলেই কোনো ভূত তোমার কাছে এসেছিল। দেখবে আজও আসবে। আজও আপনা-আপনি বাতি জ্বলবে নিভবে।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, সুইচে। গণ্ডগোল ছিল। সুইচ ঠিক করা হয়েছে। আজ আর কিছুই হবে না। তৃণা বলল, আজ আরো বেশি হবে। ভূতটার সাহস বেড়ে গেছে

তো। আজ অনেক বেশি গল্প করবে। মনে হয় গান টান গাইবে। ভূতের গান কেমন হয় কে জানে।

আখলাক সাহেব বাসায় ফিরলেন মন খারাপ কবে। গল্পটা তৃণাকে বলা ঠিক হয় নি। মেয়েটার বেশি বুদ্ধি। সে তিলকে তাল করবে। স্কুলে বান্ধবীদের বলবে। তার বান্ধবীদের মনে (বিশেষ কবে দুর্বল চিত্তের যারা) তৃত ব্যাপারটা গেথে যাবে। এইসব জিনিস একবার মনে ঢুকে গেলে মন থেকে বের করা কঠিন হয়। খুবই ভুল হয়েছে।

রাতে তিনি আজ একটু সকাল সকাল ঘুমুতে গেলেন। বাতি নিভিয়ে বিছানায় উঠার সময় মনে হলো আজ আবার বাতি নিভবে না তো? এটা মনে হওয়াতে নিজের উপরই তার রাগ লাগল। তিনি একজন বয়স্ক মানুষ। ভূতেব ব্যাপারটা যদি তার মধ্যেই গেথে যায় বাচ্চাদেব ক্ষেত্রে তার পবিণাম কী ভয়াবহ হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। বাতি নিভল না। তিনি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবে আসল ঘুমের প্রস্তুতি নিলেন। তাঁর সামান্য আশাভঙ্গও হলো, একটু যেন মন খারাপও লাগছে। তিনি কেন জানি মনে মনে চাচ্ছিলেন বাতিটা আপনা-আপনি জ্বলে উঠুক।

স্যার কি জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে পড়েছেন?

কে?

স্যার আমি। বিপদগ্রস্ত ভূত। গতরাতে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হলো। যাবার সময় জামান ভাষায় বললাম–গুটেন নাখট স্লিপেনজি ওয়েল।

ও আচ্ছা তুমি?

আখলাক সাহেব পোশ ফিরলেন। তিনি নিশ্চিত, ব্যাপারটা স্বপ্ন। স্বপ্লেই যা ঘটার ঘটছে। কিছু কিছু স্বপ্ন মানুষ ঘুরেফিরে দেখে। ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রায় প্রতিরাতেই স্বপ্ন দেখতেন। পরীক্ষাব হলে পবীক্ষা দিতে বসেছেন, পকেটে হাত দিয়ে দেখেন কলম আনেন নি। ভূতেব স্বপ্নও সেরকম কিছু হবে।

তুমি তাহলে এসেছ?

জি স্যার।

কাল তো বাতি জ্বালাচ্ছিলে নেভাচ্ছিলে। আজ কিছু করছ না, ব্যাপারটা কী?

নতুন সুইচ লাগালেন এই জন্যেই কিছু করিনি। একটা জিনিস নষ্ট করার কোনো মানে হয় ন।

তোমার নাম কী?

আখলাক সাহেব হাসির শব্দ শুনলেন। একেই বোধহয় বলে ভৌতিক হাসি। ভয়ে রক্ত জমে যাওয়ার মতো কিছু হলো না। হাসি শুনতে বরং ভালোই লাগছে। সহজ স্বাভাবিক

হাসছ কেন?

ভূত সম্পর্কে মানুষের কত ভুল ধারণা এই ভেবেই হাসি আসছে। আপনাদের নাম আছে বলে আপনাদের ধারণা আমাদেরও নাম আছে। আসলে তা না। ভূতদের স্যার নাম থাকে না।

আখলাক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তাই নাকি?

কর্মেই আমাদের পরিচয়, নামে নয়।

বলো কী?

সত্যি কথাই বলছি স্যার। যেমন ধরুন বোকা ভূতদের নাম হচ্ছে–বোকা ১, বোকা ২, বোকা ৩, বোকা ৪... যে যত বোকা তার নাম্বার তত বেশি। নাম্বার দেখেই বলে দিতে পারবেন। সে কত বড় বোকা। মানুষের বেলায় এরকম কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তার নাম থেকে বোঝা যায় না। সে বোকা না বুদ্ধিমান।

আখলাক সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। ভূতটা গম্ভীর গলায় বলল, আমাদের ব্যবস্থা স্যার খুবই বৈজ্ঞানিক।

তোমাদের নিয়মে তোমার নাম কী?

লেখক ৭৮।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তুমি লেখক নাকি?

একটু স্যার বদঅভ্যাস আছে।

বদঅভ্যাস বলছি কেন? লেখক হওয়া তো সহজ ব্যাপার না। লেখক ৭৪, তার মানে কি তুমি অনেক বড় লেখক?

দুএকটা ছোটখাট পুরস্কার স্যার পেয়েছি। গত বছর পেলাম তৃত শ্রেষ্ঠ পদক। লৌহ পদক। লৌহ পদক স্যার একটা বিরল ঘটনা।

লৌহ পদক পেয়ে গেছ, বলো কী?

আর স্যার আমার একটা রচনা ভুতস্কুলে পাঠ্য হয়েছে। এটাও একটা বিরল সম্মান।

বিরল সম্মান তো বটেই। তুমি কি দাঁড়িয়ে আছ নাকি? বোস, চেয়ারটা টেনে বোস। এতক্ষণ তুমি তুমি করে বলায় আমার তো নিজেরই খারাপ লাগছে।

আপনি স্যার লজ্জা দেবেন না।

তুমি বোস, চেয়ারে বোস।

চেয়ার টানার শব্দ হলো। কেউ একজন চেয়ারে বসল। ঘর অন্ধকার বলে তিনি কিছু দেখতে পেলেন না। আখলাক সাহেব যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভূতত্ত্বলে তোমার যে রচনাটা পাঠ্য সেটা কী?

একটা প্রবন্ধ।

নাম কী প্রবন্ধটার?

মানুষদের নিয়ে লেখা প্রবন্ধ, নাম হলো ইহা মানুষ।

ইন্টারেস্টিং প্রবন্ধ বলে মনে হচ্ছে।

স্যার, গবেষণামূলক প্রবন্ধ। শিশুভূতদের জন্যে একটু কঠিন হয়ে গেছে।

তুমি কি প্রবন্ধই লেখ না গল্প-উপন্যাসও লেখ?

গল্প লিখি। সম্প্রতি আমার একটা বই বের হয়েছে, মানুষের গল্প।

তুমি ভূত আর তোমার সব লেখালেখি দেখি মানুষদের নিয়ে।

মানুষরা যেমন ভূতের গল্প লেখে আমিও তেমন মানুষের গল্প লিখি।

দেখি একটা গল্প পড়ে শুনাও তো।

তাহলে স্যার বইটা নিয়ে আসি।

নিয়ে আসা দেখি।

ভূত বই আনতে গেল। আখলাক সাহেব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই রাতে তাঁর আর গল্প শোনা হলো না।

২. গম্ভীর ধরনের মানুষ

কলেজে আখলাক সাহেবকে সবাই চেনে গম্ভীর ধরনের মানুষ হিসেবে। যারা অঙ্ক শেখায় তাবা খানিকটা গন্তীব প্রকৃতির এমিতেই হয়ে থাকে। আখলাক সাহেব তাদের চেয়েও একটু গম্ভীব। যেদিন একটা ক্লাস থাকে তিনি ক্লাস নিয়ে বাড়ি চলে আসেন। যেদিন দুটা কিংবা তিনটা ক্লাস থাকে সেদিন ক্লাসের মাঝখানের সময়ে শিক্ষকদের কমন রুমে বসে খবরের কাগজ পড়েন। শিক্ষকদের গল্প গুজব হৈচৈ-এ কখনো অংশ নেন না। তাঁর ভালো লাগে না।

আজ একটু ব্যতিক্রম দেখালেন। কমনরুমে আখলাক সাহেব যথাবীতি খবরেব কাগজ পড়ছিলেন, তার পাশে বসেছেন বাংলাব শিক্ষক শামসুদ্দিন আহমেদ। তিনি গল্প করছিলেন ঠিক তাঁর মুখোমুখি বসা লজিকের শিক্ষক দবিরুদ্দিনের সঙ্গে। তাঁরা দুজনই খুব বন্ধু মানুষ। তবে রোজই কোনো একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে তুমুল তর্ক বেঁধে যায়। একেকটা তর্ক শেষ পর্যন্ত রাগারগি হাতাহাতির পর্যায়েও যায়। প্রিন্সিপাল সাহেব তাদের দুজনকে কাছাকাছি বসতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তারপরেও তাঁরা সামনাসামনি বসেন, সহজভাবে গল্প শুরু করেন, আরম্ভ হয় তর্ক, তর্ক থেকে গালাগালি।

তাঁদের আজকের গল্পের বিষয় হলো, নাম রাখা। শামসুদিন সাহেবের স্বভাব হলো যে-কোনো গল্পই করা হোক না কেন তাকে টেনে টুনে রবীন্দ্রনাথে নিয়ে যাওয়া। দবিরুদ্দিনের দিন দশেক আগে একটি মেয়ে হয়েছে, তার নাম এখনো ঠিক কবা হয় নি। এই প্রসঙ্গে শামসুদ্দিন সাহেব বললেন, নাম রেখে দিন মীনাক্ষী। রবীন্দ্রনাথের খুব পছন্দের নাম।

দবিরুদ্দিন বললেন, মীনাক্ষীর অর্থটা কী?

মীনের মতো অক্ষি, অর্থাৎ মাছের মতো চোখ।

আমার মেয়ের চোখ তো মাছের মতো না। দিব্যি মানুষের মতো চোখ। তার নাম মীনাক্ষী রাখব কেন? মানুষাক্ষী বরং রাখার একটা যুক্তি আছে।

রবীন্দ্রনাথের খুবই পছন্দের নাম। তিনি বুদ্ধদেব বসুর মেয়ের নাম রেখেছিলেন মীনাক্ষী।

শামসুদ্দিন সাহেব চোখ লাল করে বললেন, বোয়াল মাছের মতো চোখ–এটা বলার অর্থ কী?

বোয়াল মাছের মতো না হলে অন্য কোনো মাছের মতো, রুই মাছের মতো কিংবা পুটি মাছের মতো। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ নিশ্চয়ই কোনো একটা মাছের চোখের সাথে নাম মিলিয়ে নাম রাখেন নি। হেলাফেলা করে নাম রাখার মানুষ তিনি না।

তর্ক প্রায় বেঁধে যাচ্ছে এই পর্যায়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে আখলাক সাহেব হঠাৎ বললেন, মানুষের নাম রাখার পদ্ধতির মধ্যে সমস্যা আছে। পদ্ধতিটা ত্রুটিপূর্ণ।

শামসুদিন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ত্রুটিপূর্ণ মানে?

মানুষের নাম এমনটা রাখা যেতে পারে যা থেকে তার চরিত্র সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যাই।

কী রকম?

যেমন ধরুন যারা বোকা, তাদের সবার নাম শুরু হবে বোকা দিয়ে; তবে নামের শেষে একটা সংখ্যা থাকবে, সে সংখ্যা থেকে সে কতটা বোকা সেই সম্পর্কে একটা তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যাবে। যত বোকা, সংখ্যার মান তত বেশি।

দবিরুদ্দিন বললেন, যে একই সঙ্গে বোকা এবং জ্ঞানী, তার বেলা কী হবে? অনেক জ্ঞানী বোকাও তো সমাজে আছে। ওদের সংখ্যাই বরং বেশি।

একটা পদ্ধতি তাদের বেলাতেও বের করতে হবে। যেমন ধরুন বোকা ৭০, জ্ঞানী ৪০, অর্থাৎ সে যতটা না জ্ঞানী তারচে বেশি বোকা।

শামসুদ্দিন সাহেব হা হয়ে গেলেন। এরকম অদ্ভুত কথা তিনি এর আগে শোনেন নি। দবিরুদ্দিন বললেন, এতে নাম অনেক বড় হয়ে যাবে না?

সংক্ষেপ করার পদ্ধতি বের করা যাবে। যেমন ধরুন বোকা ৭০, জ্ঞানী ৪০ এটাকে সংক্ষেপে বলা যাবে বোজ্ঞা ৭০-৪০, বোকার বো, আর জ্ঞানীর জ্ঞা নিয়ে বোজ্ঞা, ৭০ এবং ৪০ এর মাঝখানে থাকছে একটা হাইফেন। বুঝতে পারছেন?

পারছি।

শামসুদিন এবং দবিরুদিন দুজনই পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলেন। দবিরুদ্দিন বললেন, আখলাক ভাই আপনি কি সম্প্রতি এই নিয়ে গবেষণা করছেন?

আখলাক সাহেব জবাব দিতে পারলেন না। ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেছে, তিনি ক্লাসে চলে গেলেন। ক্লাস শেষ করে কমনরুমে ফিরলেন না, বাসার দিকে চলে গেলেন। কমনরুমে ফিরে এলে জানতেন যে এই এক ঘণ্টায় তাঁর নতুন নামকরণ করা হয়েছে–মিঃ বোস্তা ৭০-৪০।

আখলাক সাহেব আজ আবার ছোট বোনের বাসায় গেলেন। মিলি তাকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, তোমার কী হয়েছে দাদা?

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, হবে। আবার কী! কিছু হয় নি তো।

তৃণা বলছিল, একটা ভূত নাকি তোমার কাছে আসে। জার্মান ভাষায় তোমার সঙ্গে গল্প করে।

আরে না। ব্যাপারটা স্বপ্ন।

এইসব আজেবাজে স্বপ্নই বা তুমি দেখবে কেন?

স্বপ্নের উপর কি কারো হাত আছে? আমি যে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করব সেই স্বপ্ন দেখব– তা তো কখনো হয় না।

দাদা আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে। তুমি একা একা থাক, এই জন্যে এসব হচ্ছে। তুমি তোমার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমার এখানে এসে থাক। আমি তোমার ঘর আলাদা করে দেব। তৃণাকে বলে দেব যেন কখনো তোমাকে বিরক্ত না করে।

আহা যন্ত্রণা করিস না তো। সামান্য স্বপ্ন নিয়ে ...

তোমার মুখও তো কেমন শুকনা শুকনা লাগছে।

আখলাক সাহেব খুবই বিরক্ত হলেন। কঠিন গলায় বললেন, মুখের আবার শুকনা ভেজা কী? মুখ কি তোয়ালে যে শুকনা থাকবে। আবার ভেজা থাকবে।

মিলি বলল, দাদা শোন, বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে তুমি আবেকটু ভাব। তোমার পায়ে পড়ি দাদা। প্লিজ। তোমার জন্যে যে মহিলার কথা আমি ভেবে রেখেছি তিনি অসাধারণ একজন মহিলা। খুব অল্প বয়সে তার স্বামী মাবা গিয়েছিল, তিনি আর বিয়ে করেন নি। তুমি যেমন নিঃসঙ্গ তিনিও নিঃসঙ্গ। তাছাড়া বাহান্ন কোনো বয়সই না। পিকাসো ৮২ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন।

আমি কি পিকাসো? আমাকে কখনো ছবি আঁকতে দেখেছিস? এই নিয়ে আর একটা কথা না।

আখলাক সাহেবের একটিই বোন। বোনের ভালোবাসা তার কাছে অত্যাচারের মতো লাগে। এ কারণেই তিনি মিলিদেব বাড়িতে কম আসেন। এটা তাকে বলাও যায় না। বললে মনে কষ্ট পানে

দাদা, রাতে কী খাবে?

রাতে কিছু খাব না।

এটা তুমি কী বললে দাদা, তোমাকে আমি না খাইয়ে রাতে ছেড়ে দেব? ঐ দিন এলে, আমি ছিলাম না। বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম। এত সুন্দর একটা মেয়ে বান্দরের মতো একটা ছেলেকে বিয়ে করেছে। কথাও বলে বান্দরের মতো কিচকিচ করে। আবার প্রত্যেকটা শব্দের সঙ্গে একটা চন্দ্রবিন্দু লাগায়। মনে হয় নাকে প্রবলেম আছে। আমাকে দেখে বলল, আঁফা ভাঁলো আছেন?... .তুই আমাকে চিনিস না জানিস না, আমার সঙ্গে তোর এত কীসের কথা?

আখলাক সাহেব বড়ই বিরক্ত হচ্ছেন। মিলি একবার কথা শুরু করলে থামে না। ছেলেমেয়েরা মাকে দেখে শেখে, তৃণা মার স্বভাব পাচ্ছে এটা অত্যন্ত আশঙ্কার কথা। তবে মিলির স্বামী আবু তাহের কথা একেবারেই বলে না। তার বাক্যালাপ হ্যাঁ হুঁর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা আশার কথা। সবাই কথা বললে এ বাড়িতে আসাই সমস্যা হতো। আবু তাহের ডাক্তার। এম আর সি পি। হাসপাতালের বাইরে তার পশার এমন যে সে ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতে পারে না। বাড়িতে সে বিশ্রাম করতে আসে বলেই বোধহয় কথাবার্তা বলে অকারণ পরিশ্রম করে না। সারাক্ষণ ঝিম ধরে থাকে।

রাতে আখলাক সাহেবকে খেয়ে যেতে হলো। মিলি শখ করে রোধেছে। সাধারণ খাওয়া না। পোলাও কোর্মা। পোলাও হয়েছে শক্ত চাল চাল। কোর্মা লবণের জন্যে মুখে দেয়া যাচ্ছে না। এত আগ্রহ করে রোধেছে, কিছু বলা যাচ্ছে না। শুধু আবু তাহের মুখ শুকনো করে বলল, আবার তুমি রোধেছা? রান্নার জন্যে বাবুর্চি তো আছে। নিজে রাঁধতে গেলে কেন?

মিলি বিরক্ত মুখে বলল, দাদা এসেছে আমি রাধব না তো কি পাড়ার লোকে এসে রোধে দিয়ে যাবে? বাবুর্চির রান্না আমি দাদাকে খাওয়াব? তোমার খেতে ইচ্ছে না হলে খেয়ো না। আমি তো তোমার পায়ে ধরে সাধি নি যে খেতেই হবে। খেতে কি খারাপ হয়েছে?

তাহের বলল, খেতে ভালোই হয়েছে। তবে পোলাও মুখে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চাবাতে হয়। এতক্ষণ চাবানোর ধৈর্য থাকে না।

মিলি স্বামীর দিকে আগুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিল। ভাইয়ের পাতে পোলাও তুলে দিতে দিতে বলল, দাদা যে ভূতটা তোমার কাছে আসে তার নাম কী?

আখলাক মনের ভুলে বলে ফেললেন, ওর নাম লেখক ৭৪।

ভূতের প্রসঙ্গটা তিনি আনতে চাচ্ছিলেন না। তারপরেও এসে গেল।

মিলি কিছু বলার আগেই আবু তাহের বলল, ভূতের কী নাম বললেন?

লেখক ৭৮।

এটা কী ধরনের নাম?

ভূত সমাজের নাম রাখার এই ধারা। আমরা এই ধারার সঙ্গে পরিচিত নই বলে আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। ওদের কাছেও ঠিক এমনিভাবে আমাদের নামগুলিও খুব হাস্যকর লাগে।

মিলি বলল, হাস্যকর নাম তো আমাদের আছেই। আমার এক বান্ধবী তার ছেলের নাম রেখেছে–গুলকি। আমি বললাম কীরে এত নাম থাকতে গুলকি নাম রাখলি কেন? সে কিছু বলে না, শুধু হাসে।

তাহের একবার বিরক্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল। যে দৃষ্টির অর্থ হলো–চুপ কর তো, সব কিছুতে কথা বলবে না। মিলি সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, আমাদের পাশের বাড়ির কাজের মেয়েটার নাম কী জানো দাদা? তার নাম তক্তি বেগম।

তাহের বলল, একটু চুপ করবে? ভাইজানের সঙ্গে একটা জরুরি কথা বলছি। মিলি বলল, আমিও জরুরি কথাই বলছি। আমার কথাগুলি কম জরুরি না।

তোমার জরুরি কথাগুলি একটু পরে বলো, আমারটা শেষ করে নিই। তুমিতে একবার কথা শুরু করলে শেষ করতে পার না। নদীর স্রোতের মতো চলতেই থাকে।

তাহের আখলাকের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইজান আপনার এই ভূতের ব্যাপারটা ঠিক কী বলুন তো। আমি ভাসাভাসা ভাবে শুনলাম। সত্যি কি কিছু দেখেছেন?

বুঝতে পারছি না, মনে হয় স্বপ্ন।

রোজই দেখছেন?

পরপর দুরাত দেখলাম। মনে হয় আজও আবার দেখব।

আজ রাতে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুবেন। যাবার সময় আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে যাবেন। বিছানায় যাবার আধা ঘণ্টা আগে খাবেন। ওষুধ খাবার পর ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাবেন। রোজ রোজ ভূত দেখা কোনো কাজের কথা না। শেষ পর্যন্ত একটা মানসিক সমস্যা হয়ে যাবে। শুরুতেই সাবধান হওয়া ভালো।

মিলি বলল, তুমিও তো দেখছি কথা শেষ করতে পারছি না। বকবক করেই যাচ্ছি।

আর করব না। এখন তুমি শুরু করতে পোর।

মিলি বলল, দাদা তুমি আমাকে ভূতের ব্যাপারটা ভালোমতো বলো তো।

আখলাক সাহেব বললেন, ভালোমতো বলার কিছু নেই। দুঃস্বপ্ন। আর কিছু না।

দাদা তুমি পেট ঠাণ্ডা রাখবে। পেট গরম হলেই লোকজন দুঃস্বপ্ন দেখে। একবার কী হয়েছে শোন, আমি মুনার জন্মদিনের পাটিতে গিয়ে এক গাদা ভাজ্যভুজি খেয়েছি। বাসায় এসে আবার খাসির মাংস দিয়ে ভাত খেলাম। পেট হয়ে গেল গরম। রাতে স্বপ্নে দেখি কী লক্ষ লক্ষ পিঁপড়া খুবলে খুবলে আমার গায়ের মাংস খেয়ে ফেলছে। কী যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। এখনো মনে হলে গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে যায়। তুমি দাদা এখন থেকে সহজপাচ্য খাবার খাবে। মশলা একেবারে দেবেই না। পোপে পেটের জন্যে ভালো, চেষ্টা করবে: বোজই পেঁপে খেতে। পেঁপে সিদ্ধ করে বেটে একটু কাঁচা মরিচ, পেয়াজ দিয়ে ভর্তা বানিয়ে খেয়ে দেখো, ভালো লাগবে। সঙ্গে সরষে বেটে দিতে বলবে। নতুন সরষে, পুরনোটা দিলে তিতা লাগবে।

আবু তাহের ছটা ঘুমের ট্যাবলেট দিলেন। প্রতি রাতে শোয়ার আগে দুটা করে খেতে হবে। আখলাক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভূতপ্রেত এইসব নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না ভাইজান। ভূত-প্রেতের সময় আমরা পার কবে এসেছি।

আখলাক সাহেবকে এইসব কথা বলা অর্থহীন। ভূত-প্রেতের সময় যে আমরা পার কবে এসেছি তা তার থেকে বেশি কেউ জানে না। অথচ তার কপাল এমন যে উপদেশগুলি তাঁকে শুনতে হচ্ছে।

যে ভূতটার কথা বলছেন সেটা দেখতে কেমন?

দেখি নি তো কখনো। ঘর অন্ধকার থাকে, কাজেই দেখা হয় নি।

ও আচ্ছা।

আখলাক সাহেব বিষন্ন মুখে বললেন, ভূতটাকে যে এখনো দেখি নি সেটাই আমার কাছে একটা খটকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কী রকম?

স্বপ্ন হলে ভূতটাকে দেখতে কোনো অসুবিধা ছিল না। ভূত-টুত এইসব স্বপ্নেই বেশি দেখা যায়। অথচ এখনো দেখলাম না।

স্বপ্ন অনেক রকম হয় ভাইজান। স্বপ্নে শুধু শব্দও শোনা যায়।

তাও ঠিক।

এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী। আমরা এই শতাব্দীর প্রায় শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। চাঁদে মানুষ নেমে গেছে। মঙ্গল গ্রহে খুব শিগগিরই নামবে। আমাদের স্পেস প্রোব পাইওনিয়ার সৌর মণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেছে। আমরা ভাইরাস প্রায় জয় করতে যাচ্ছি, এই সময় আপনার মতো শিক্ষিত একজন মানুষ ...

আখলাক সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবলেন–তাহের যে মিলির চেয়ে কম কথা বলে তা তো না, বরং বেশিই বলে। মিলির কারণে কথা বলার সুযোগ পায় না বলে বোধহয় বলতে পারে না। খুবই খারাপ লক্ষণ। যে সব ডাক্তার বকবক করে তাদের পশার হয় না।

বুঝলেন ভাইজান, ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়বেন, লম্বা ঘুম দেবেন। ভূতের কথা মনে স্থান দেবেন না। একটা কথা মনে রাখবেন–ভূতের বাস হচ্ছে মানুষের মনে। ভুল বললাম, আসলে মন বলেও কিছু নেই। যদিও আমরা কথায় কথায় মন বলি। আসল জিনিস হচ্ছে মস্তিষ্ক, দি ব্রেইন। ভূতের বাস হচ্ছে আমাদের ব্রেইনে, মস্তিষ্কে। আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে .

আচ্ছা খেয়াল রাখব।

প্রয়োজনে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব। আমার বন্ধু মানুষ।

আচ্ছা ঠিক আছে।

ভাইজান, কী বললাম মনে থাকবে তো?

হুঁ। মনে থাকবে।

রাতে তিনি ঘুমের ওষুধ খেলেন। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেলেন। ওষুধ খাওয়ার আধা ঘণ্টা পর ঘুমুতে যাবার কথা, তার আগেই ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। খুব কড়া ওষুধ, বোঝাই যাচ্ছে। দুটা না খেয়ে একটা খেলেই হতো। তিনি বিছানায় গেলেন প্রায় চোখ বন্ধ করে। বালিশে মাথা রাখতে না রাখতেই তাঁর ঘুম কেটে গেল। চোখে এখন আর একফোঁটা ঘুম নেই। অবশ্য তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ হতে লাগল যে তিনি আসলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তবে স্বপ্নে দেখছেন যে জেগে আছেন।

স্যার কেমন আছেন?

আখলাক সাহেব পোশ ফিরলেন। কিছু দেখা যায় কিনা। না কিছু দেখা যাচ্ছে না। চারদিক ফাঁকা।

ঐ দিনের জন্যে স্যার খুবই লজ্জিত।

ঐ দিন কী হয়েছিল?

আপনি আমার লেখা পড়তে চাইলেন, আমার নিয়ে আসতে দেরি হলো। এসে দেখি আপনি আরাম করে ঘুমাচ্ছেন। আর আপনাকে জোগালাম না। আপনার আবার সকালে ক্লাস থাকে। লেখা স্যার আজ নিয়ে এসেছি।

কোনটা এনেছ?

অনেকগুলি এনেছি।

তোমরা কি বাংলা ভাষাতেই লেখা?

আমরা স্যার বাঙালি ভূত। আমরা বাংলা ছাড়া কীসে লিখব?

ভূত-ভাষা বলে কিছু নেই তাহলে?

জি না।

কথা বলার সময় তোমরা শুধু চন্দ্রবিন্দু বেশি ব্যবহার কর, তাই না?

এটাও স্যার আপনাদের ভুল ধারণা। আপনারা ভূতের গল্প লেখার সময় ভূতের মুখে চন্দ্রবিন্দু দেন। ভূত বলে–আঁমারে মাছ দেন। এটা স্যার ঠিক না। কারো নাকে যখন সমস্যা থাকে তখন সে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করে নাকে কথা বলে। আমাদের নাকই নেই।

তোমাদের নাক নেই নাকি?

জি না স্যার। আমরা তো আসলে বাতাসের তৈরি। বাতাসের আবার নাক কী? আমাদের সম্পর্কে আসলে আপনারা কিছুই জানেন না। না জেনেই গল্প লেখা হয়। অথচ আমাদের দেখুন–মানুষদের সম্পর্কে আমাদের প্রতিটি লেখার পেছনে আছে দীর্ঘ দিনের বিসার্চ। ইহা মানুষ প্রবন্ধটা লেখার জন্যে আমাকে দশ বৎসর নিরলস গবেষণা করতে হয়েছে।

বলো কী!

প্রবন্ধটা কি স্যার পড়ব?

পড়।

মানুষ হলো কুড়ি আঙ্গুল বিশিষ্ট প্রাণী। কুড়িটি আঙ্গুলের ভেতর সে মাত্র দশটির ব্যবহাব জানে। বাকি দশটি আঙ্গুল, যাদেব অবস্থান পায়ে, তাদের ব্যবহার সে জানে না।

আখলাক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, পায়ের আঙ্গুলের আবার ব্যবহার কী?

অবশ্যই ব্যবহার আছে। প্রকৃতি আঙ্গুল দিয়েছে যখন তখন ব্যবহারও দিয়েছে। মানুষ তা জানে না, জানার চেষ্টাও করে না।

আখলাক সাহেব ই বলেই চুপ কবে গেলেন। অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ কী তিনি নিজেও কোনোদিন জানার চেষ্টা করেন নি।

স্যার কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?

না।

মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির এই সীমাবদ্ধতার কারণ কি জানেন?

না।

একটাই কারণ, মানুষ দুপায়ে হাঁটে। মানুষ চার পায়ে হাঁটলে তার জ্ঞান বুদ্ধিব কোনো সীমা থাকত না।

আখলাক সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, এই জাতীয় উদ্ভট কথা আমাকে বলবে না। মানব জাতির এই যে উত্থান তার কারণ হঠাৎ একদিন আমরা গাছ থেকে নেমে হাঁটার চেষ্টা করতে লাগলাম। সেই চেষ্টা না করলে এখনো আমাদের গাছে গাছে বানর হয়ে ঝুলতে হতো।

ভুত হাসি হাসি গলায় বলল, আসল ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। মানুষ দুপায়ে হাঁটে, তাকে ব্যালান্স রাখতে হয়। মানুষের ব্রেইনের বেশিরভাগই খরচ হয়ে যায় ব্যালান্স রাখার হিসাবনিকাশে। প্রতিনিয়ত ব্রেইনকে এই হিসাব করতে হচ্ছে। এই হিসাব কঠিন ও জটিল হিসাব। মানুষ যদি চারপায়ে হাঁটত তাহলে তার মস্তিষ্কে চাপ থাকত। অনেক কম। সে তার ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারত।

আখলাক সাহেব কিছু বললেন না। ভূতের যুক্তি তিনি ফেলে দিতে পারছেন না। আবার যুক্তি মেনে নিতেও পারছেন না। তিনি অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলার জন্যে কয়েকবার শুকনো

ধরনের কাশি কাশলেন। ভূতটা বলল, স্যার আপনার অস্বস্তিতে কাশাকশি করার দরকার নেই। আমি সত্যি কথাই বলছি।

আখলাক সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আমরা যদি এখন দুপায়ে না হেঁটে চারপায়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করি...

তখন স্যার জ্ঞান বুদ্ধিতে আপনাদের নাগাল পাওয়া সমস্যা হবে। আপনারা অনেক দূর এগিয়ে যাবেন।

তবু ব্যাপারটা একটু যেন হাস্যকর।

নতুন সব জিনিসই স্যার হাস্যকর। মানুষ যখন প্রথম জুতা পায়ে দিল তখন সবাই তাদের নিয়ে হাসাহসি করেছে। আর আজ আপনি খালি পায়ে কলেজে ক্লাস নিতে যান আপনাকে নিয়ে হাসোহাসি শুরু হবে। ভুল বললাম স্যার?

না ভুল বলো নি।

স্যারের কি ঘুম পেয়ে গেছে নাকি?

বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে এতক্ষণ যা ঘটছে পুরোটাই স্বপ্নে ঘটছে।

এরকম মনে হওয়ার কারণ কী?

দুটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমালাম তো। আচ্ছা ভালো কথা, ভূতরা কি স্বপ্ন দেখে?

দেখে। তাদের সবই দিবাস্বপ্ন। এরা দিনে ঘুমায় তো, তাই দিবাস্বপ্ন। স্যার কি একটা কবিতা শুনবেন?

কবিতা?

মানুষ নিয়ে একটা ছড়ার মতো লিখেছিলাম। সাপ্তাহিক ভূত পত্রিকার বর্ষশুরু সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। স্যার পড়ব?

পড়। ভূত বেশ সুরেলা গলায় কবিতা পাঠ শুরু করল

মানুষ।
হুঁসহস।
ভুসতুস।
মানুষ।
খুশখুশ।
ফুসফুস।
মানুষ
ঠুববুস
ভুববুস।
মানুষ
হাংকুশ
পাংকুশ।

মানুষ
মানুষ।

কবিতা চলতেই থাকল। সুরেলা গলার কবিতা শুনতে শুনতে আখলাক সাহেব গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন; তবে ঘুমের মধ্যেও কবিতা চলতে থাকাল–মানুষ, হুঁসহস তুসতুস। মানুষ, খুশখুশ ফুসফুস। মানুষ, ঠুববুস ভুববুস...

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

৩. সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল

সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল এমরান সুবাহানের ঘরে আখলাক সাহেবের ডাক পড়েছে। আখলাক সাহেব কারণটা ঠিক ধরতে পারছেন না। বিশেষ কোনো জরুরি কারণ ছাড়া এমরান সাহেব কোনো শিক্ষককে তার ঘরে ডাকেন না। এমরান সাহেব মানুষটা রাশভারী ধরনের। পুরনো কালের প্রিন্সিপালদের মতো হাবভাব। শুধু ছাত্র না, শিক্ষকরাও তাঁকে ভয় পান। তিনি অকারণে কাউকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান না। যখন ডেকে পাঠান তখন বুঝতে হবে বিশেষ কিছু ঘটে গেছে। ভয়ঙ্কব কিছু। আখলাক সাহেব ঠিক বুঝতে পারছেন না তাঁর ক্ষেত্রে সেই ভয়ঙ্কর কিছুটা কী?

এমরান সাহেব চিঠি লিখছিলেন, লেখা বন্ধ রেখে হাসি মুখে বললেন, আখলাক সাহেব বসুন।

আখলাক সাহেব বসতে বসতে বললেন, স্যার ডেকেছিলেন?

হ্যাঁ। আপনাদের সঙ্গে তো সামাজিক সৌজন্যের কথাবার্তাও হয় না। এমন ব্যস্ত থাকি। খবর কী বলুন তো?

খবর ভালো।

ক্লাস চলছে কেমন?

জি ভালো।

চা খাবেন?

জি না।

খান, আমার সঙ্গে এককাপ চা খান।

এমরান সাহেব বেল টিপে বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। আখলাক সাহেব বললেন, স্যার আপনি কি আমাকে বিশেষ কিছু বলার জন্যে ডেকেছেন?

এমরান সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, না বিশেষ কিছু না। আচ্ছা ভালো কথা, আপনি নাকি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রদের বলেছেন–মানুষের দুপায়ে হাঁটা উচিত না। চারপায়ে হামাগুড়ি দেয়া উচিত। এরকম কিছু কি বলেছেন?

জি বলেছি।

রসিকতা করে নিশ্চয়ই বলেছেন। আমাদের সমস্যা হচ্ছে কোনটা রসিকতা আর কোনটা রসিকতা না সেটা ধরতে পারি না। সিরিয়াস বিষয়গুলিকে রসিকতা মনে করি। আর রসিকতার বিষয়গুলিকে সিরিয়াসভাবে নিয়ে নিই। আই কিউ কম হলে যা হয়। জাতিগতভাবেই আমাদের আই কিউ কম।

আমি স্যার রসিকতা করি নি।

এমরান সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। চা চলে এসেছে। তিনি চায়ের কাঁপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, আপনি ছাত্রদের হামাগুড়ি দিতে বলেছেন?

জি না। হামাগুড়ি দেয়ার উপকারিতাটা বলেছি।

এমরান সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, কী উপকারিতা?

আখলাক সাহেব উপকারিতা ব্যাখ্যা করলেন। সুন্দর করে ব্যাখ্যা করলেন। এমরান সাহেব অবাক হয়ে শুনলেন। এক সময় গলা খাকারি দিয়ে বললেন, আপনার যুক্তি ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে। তবে ব্যাপার হচ্ছে কী, একেবারে রেভূলিশনারী ধারণার ব্যাপারে। আমাদের অনেক সাবধান হতে হবে। আজ। আপনার কথা শুনে কলেজের সব ছাত্রছাত্রী যদি হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করে সেটা কি ভালো হবে?

আখলাক সাহেব কিছু বললেন না। শান্ত মুখে চায়ের কাঁপে চুমুক দিলেন। এমরান সাহেব বললেন, ক্লাসে বক্তৃতায় এইসব আমার মনে হয় না বলাই ভালো। তাছাড়া আপনার বিষয় হচ্ছে অঙ্ক। হামাগুড়ি তো আপনার বিষয় নয়। আপনি তো আর ড্রিল টিচার না। ঠিক না?

জি স্যার।

আবার শুনলাম মানুষের নামকরণ পদ্ধতিটাও নাকি আপনার কাছে ক্রুটিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

আমরা যেভাবে নাম রাখি তাতে নাম থেকে চট করে কিছু বোঝা যায় না। মানুষের নাম এমন হওয়া উচিত যেন নাম শুনেই বলে দেয়া যায় মানুষটা বোকা না জ্ঞানী, বুদ্ধিমান না ধূর্ত। রাসায়নিক যৌগগুলির নাম যেমন শোনা মাত্র বোঝা যায় ব্যাপারটা কী। ১-৩ বিউটাডাইন বললেই আমরা জেনে যাই ১ ও ৩ পজিশনে ডাবল বন্ড আছে।

এমরান সাহেব শুকনো গলায় বললেন, ও আচ্ছা।

স্যার আমি কি এখন উঠব?

বসুন, আরেকটু বসুন।

আখলাক সাহেব দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, প্রিন্সিপাল সাহেবের কথায় আবার বসলেন।

এমরান সাহেব বললেন, আপনার তো অনেক ছুটি পাওনা আছে, আপনি কিছুদিন ছুটি নিয়ে ঘুরে আসুন না কেন?

ছুটির কোনো প্রয়োজন দেখছি না স্যার।

ছুটির প্রয়োজন দেখবেন না কেন? ছুটির প্রয়োজন আছে। নগর জীবনের প্রবল চাপে আমাদের ভেতর নানান সমস্যা দেখা দেয়। এইসব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আমাদের মাঝে মাঝে ছুটি নেয়া খুব জরুরি হয়ে পড়ে। Far from the madding crowd, আপনি ছুটির দরখাস্ত করুন। আপনার ছুটি তো পাওনাও আছে, আছে না?

জি স্যার আছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তাহলে আর সমস্যা কী? আপনি এক কাজ করুন–সমুদ্র দেখে আসুন। রোগ সারানোয় সমুদ্রের মতো কিছু হয় না।

আখলাক সাহেব বললেন, স্যার আমার তো কোনো রোগ নেই।

জানি। সুস্থ মানুষের জন্যে সমুদ্র আরো বেশি সুফলদায়ক।

এমরান সাহেব বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন। ছুটির ফর্ম আনতে বললেন। আখলাক সাহেবকে সাত দিনের ছুটি নিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের ঘর থেকে বেরুতে হলো।

আখলাক সাহেব খুবই বিরক্ত বোধ করছেন। এই সাত দিন তিনি ঘরে বসে থেকে কী করবেন? পাহাড় সমুদ্র এইসব বিষয়ের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। মিলিদের সঙ্গে একবার সমুদ্র দেখতে গিয়েছিলেন, সমুদ্রের গর্জন শুনে মাথা ধরে গেল। রাতে আর ঘুম আসে না। গাদাখানিক পানি দেখার মধ্যে লোকজন কী মজা পায় কে জানে।

তিনি টিচার্স কমন রুমে এসে বসলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন সবাই যেন কেমন কেমন দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। শামসুদিন সাহেব গলাখাকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন আখলাক সাহেব?

ভালো। সাত দিনের ছুটি নিয়েছেন শুনলাম?

হুঁ।

সমুদ্র দেখতে যাচ্ছেন?

আখলাক সাহেব ভেবে পেলেন না। তাঁর ছুটির খবরটা ইতিমধ্যে জানাজানি হলো কীভাবে! তিনি তো কাউকে কিছু বলেন নি।

শামসুদিন সাহেব বললেন, আপনার হামাগুড়ি থিওরি শুনলাম। অসাধারণ। বৈপ্লবিক বলা যেতে পাবে।

আপনার সে-রকম মনে হচ্ছে?

অবশ্যই মনে হচ্ছে। থিওরি অব রিলেটিভিটির পর এমন বৈপ্লবিক ধারণা আর আসে। নি। কে কী বলবে না বলবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। লোকে আপনাকে পাগল ভাবলেও আপনি কেয়ার করবেন না। গ্যালিলিও যখন বললেন, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, তখন অনেকেই তাঁকে পাগল ভেবেছিলেন। মহান থিওরিব প্রচারকরা সবসময়ই পাগল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। গ্রেট ট্র্যাজেডি।

দবিরুদ্দিন বললেন, আপনার থিওরি আমার কাছেও গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে। শুধু একটাই সমস্যা আমাদের দুজোড়া করে জুতা লাগবে। পায়ের জন্যে এক জোড়া, আবার হাতে পরার জন্যে আরেক জোড়া। হাতে পরা জুতার অন্য একটা নাম থাকা দরকার। হুতা নাম দিলে কেমন হয়? পায়েরটা জুতা আর হাতেরটা হুতা।

আখলাক সাহেবের সন্দেহ হলো এরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছে। তাঁর মন বিষন্ন হলো। তিনি কাউকে নিয়ে রঙ্গ রসিকতা করেন না। তারা কেন তাকে নিয়ে করবে?

শামসুদ্দিন বললেন, শুধু হাতের জুতা থাকলেই হবে না হাঁটুর জন্যেও কিছু একটা দরকার। হামাগুড়ি দেয়ার সময় হাঁটু মাটিতে লাগে। চামড়া বা প্লাস্টিকের টুপি জাতীয় কিছু লাগবে হাঁটুর জন্যে। এইসব সমস্যা সমাধান করতে হবে।

দবিরুদ্দিন বললেন, আর একটা বড় সমস্যার কথা আপনারা চিন্তাই করছেন না। ঈদের সময় রাস্তা-ঘাটের ভিড় লক্ষ করেছেন? চারপায়ে হাঁটলে অনেকখানি জায়গা নিয়ে নেবে। ভিড়ের অবস্থাটা হবে কী?

শামসুদিন বললেন, এর একটা ভালো দিকও আছে। ছোট বাচ্চাকাচ্চারা ঘোড়ার মতো পিঠে বসে থাকবে। এরা ঘ্যানঘ্যান করবে না। আনন্দে থাকবে। ঘোড়ার পিঠের হাতির হাওদার মতো একটা হাওদা থাকলে বাচ্চারা পড়ে যাবে না। বেল্ট দিয়ে হাওদা কোমরের সঙ্গে বাধা থাকবে।

আখলাক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। এইসব কথাবার্তা শুনতে তাঁর আর ভালো লাগছে না। আগামী সাত দিন তাঁর কিছু করার নেই–ভাবতেই খারাপ লাগছে। বাসায় ফিরতেও ইচ্ছা করছে না। আচ্ছা লোকজন কি তাঁকে পাগল ভাবতে শুরু করেছে? পাগলের কোনো আচরণ কি তিনি করছেন? মনে হয় না তো। অবশ্যি তিনি কোনো পাগলকে ভালোভাবে লক্ষ করেন নি। ছোটবেলায় মামার বাড়িতে একটা পাগল আসত। তাকে দেখে দৌড়ে ঘরে পালাতেন। তার আচার আচরণ ভালো মতো দেখা হয় নি। একটা বড় ভুল হয়েছে। এখন থেকে পাগল দেখলে খুব ভালো করে লক্ষ করতে হবে। দূর থেকে লক্ষ করা। কাছে যাওয়া যাবে না। তিনি কুকুর এবং পাগল এই দুই জিনিসকে বড়ই ভয় পান।

৪. আখলাক সাহেব রাত ঠিক নটায় ভাত খান

আখলাক সাহেব রাত ঠিক নটায় ভাত খান। রাতে আমিষ খান না। সামান্য ভাত, একটা ভাজি আর ডাল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমিষের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয় বলে কোথায় যেন পড়েছিলেন। তিনি তা মেনে চলছেন।

মোতালেব ভাত নিয়ে এসে অবাক হয়ে দেখল আখলাক সাহেব বিছানার উপর চারপায়ে ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে আছেন। ঘোড়া যেভাবে কোমর নাড়ায় তিনিও মাঝে মাঝে সেভাবেই কোমর নাড়াচ্ছেন।

মোতালেব বলল, আফনের কী হইছে?

কিছু হয় নি।

আফনে ঘোড়া হইছেন ক্যান?

আখলাক সাহেব ঠিক হয়ে বিছানায় বসলেন। তিনি যে হামাগুড়িব মতো কবছিলেন নিজেও বুঝতে পারেন নি। ব্যাপারটা ঠিক হয় নি। নিজের উপরই রাগ লাগছে। মোতালেব আবার বলল, আফনের কী হইছে?

বললাম তো কিছু হয় নি। এটা হচ্ছে এক ধরনের ব্যায়াম। চিন্তা শক্তি বাড়াবার ব্যায়াম!

ো আইচ্ছা।

এখন থেকে এই ব্যায়াম তুইও কববি। রোজ দুঘণ্টা করে।

মোতালেবের মুখ হা হয়ে গেল। আখলাক সাহেব উৎসাহিত গলায় বললেন–তোর ব্রেইন বলে তো কোনো পদার্থ নেই। এক বৎসর চেষ্টা করে অক্ষর জ্ঞান করাতে পারলাম না। এই ব্যায়ামের পরে দেখবি ফটাফট অক্ষর শিখে ফেলবি। আজ থেকেই শুরু কর।

মোতালেবকে খুব আগ্রহী মনে হলো না। বরং তাকে চিন্তিত মনে হলো। তবে আখলাক সাহেব খুবই আগ্রহ বোধ করছেন। ভূত যা বলছে তা সত্যি কিনা তা পরীক্ষা করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

মোতালেব!

জি খালুজান।

সকালে এক ঘণ্টা আর সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা দুঘণ্টা চারপায়ে থাকবি।

জি আইচ্ছা।

আখলাক সাহেব খেতে বসেছেন। আরাম করে খাচ্ছেন। মোতালেব বিমর্ষ মুখে তাঁর খাওয়া দেখছে। আখলাক সাহেব বললেন, চারপায়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। ইচ্ছা করলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবি। চারপায়ে যাবি।

মাইনষে পাগল কইব।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, পাগল বলবে কেন? এর মধ্যে পাগল বলার কী আছে?

উলট পালটা কাম করলে লোকে পাগল কয়।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, উলটা পালটা কাজ মানে কী?

এই ধরেন। ভাত খাওনেব সমুয়া পাগল করে কী–আগে বেবাক তরকারি খাইয়া ফেলে। পরে হুঁদা ভাত কপকপাইযা খায।

আখলাক সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করলেন তিনি নিজেও ভাজি আগে খেয়ে ফেলেছেন। ভাতে এখনো হাত দেন নি। ব্যাপারটা অন্যমনস্কতার জন্যে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবুও খানিকটা অস্বস্তি লেগেই রইল। তাঁর ক্ষিধে নষ্ট হয়ে গেল। তিনি এক চুমুকে ডালেব বাটি শেষ করে ফেললেন। তাঁর অস্বস্তি আরো বাড়ল। ভাত রেখে ডাল, ভাজি সব খেয়ে ফেলেছেন–এব। মানে কী? তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। তিনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন? মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে? ভূত বলে যাকে দেখছেন সে কি তার উত্তপ্ত এলোমেলো মস্তিষ্কের কল্পনা?

মোতালেব।

জ্বে খালুজান।

তুই কি ভূত বিশ্বাস করিস?

অবশ্যই করি। না করনেব কী আছে? চাইরিদিক কিলবিল করতাছে ভূতে।

বলিস কী?

মানুষ যেমুন আছে নানান পদের, ভূতও আছে নানান পদের। বাড়ির কোণাতে থাকে এক ভূত, তারে কয় কুনি-ভূত। দরজার চিপাত থাকে এক-কিসিমের ভূত, তার নাম চিপাভূত। আছে কন্দ কাটা, আছে মেছো ভূত...

চুপ কর।

জ্বে আইচ্ছা চুপ করলাম।

ভূত বলে জগতে কিছু নাই। বুঝলি?

জ্বে বুঝছি।

যা এখন থালাবাসন নিয়ে সামনে থেকে যা।

জ্বে আইচ্ছা।

মোতালেব বিমর্ষ মুখে সরে গেল। সে খুবই চিন্তিত বোধ করছে।

৫. আখলাক সাহেব একটা রুটিনের মতো করেছেন

আখলাক সাহেব একটা রুটিনের মতো করেছেন–রাতে ঘুমাতে যাবার আগে বাতি নিভিয়ে চারপায়ে বিছানায় কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে বিছানার এ মাথা থেকে ও মাথায় যান। আবার কখনো কখনো এক জায়গায় ঘুরপাক খান। এতে তাঁর শরীরটা বেশ হালকা ও ঝরঝরে লাগে। আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা তো বটেই। শরীরের ভর দুটা পায়ে না থেকে চারটা পায়ে চলে যাওয়ায় মোটামুটি আরাম বোধ হয়। এভাবে থাকলে চিন্তা-শক্তি ভালো হয়। কিনা তাও তিনি পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষার ফল সম্পর্কে তিনি এখনো নিশ্চিত হতে পারেন নি। তবে স্মৃতি-শক্তি এই অবস্থায় বাড়ে বলে তাঁর ধারণা। ছোটবেলায় স্কুলে পড়া অনেক কবিতা তাঁর এই অবস্থায় মনে পড়ে। যা অন্য সময় মনে পড়ত না। ক্লাস টেনে মাইকেলের খটমটে কবিতা মেঘনাদবধের একটা অংশ পাঠ্য ছিল। কোনোদিন সেটা তিনি মুখস্ত করার চেষ্টা করেন নি। প্রয়োজনও বোধ করেন নি। চারপায়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ সেই কবিতা তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করলেন–

অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু
রাক্ষস কুল ভরসা পুরুষ বচনে
কহিলা লক্ষণ শূরে, বীরকুলগ্লানি
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক তোরে!
রাবন নন্দন আমি, না ডারি শমনে
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর এ চিরদুঃখ রহিলরে মনে!

তিনি পুরো কবিতাটাই বোধহয় বলতে পারতেন। কিন্তু তার আগেই মোতালেব এসে ঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলে দিল। এবং চোখে মুখে রাজ্যের ভয় নিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, কী চাস?

মোতালেব বলল, কিছু চাই না। আফনে কী করেন?

কী করি সে তো দেখতেই পাচ্ছিস। রিল্যাক্স করছি। ঘুমোবার আগে সামান্য একসারসাইজ। যা, বাতি নিভিয়ে চলে যা। গাধার মতো তাকিয়ে থাকিস না।

জ্বে আইচ্ছা।

ঘুমোবার আগে চারপায়ে থাকার ব্যাপারটায় হয়তো সামান্য হাস্যকর দিক আছে, তবে এটাকে একসারসাইজ হিসেবে নিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ইয়োগার অনেক আসন আছে খুবই হাস্যকর। মাথা নিচে ঠ্যাং আকাশে। সেই ঠ্যাং দিয়ে আবার সাইকেল চালানোর ভঙ্গি করা। লোকজন সেটাকে হাস্যকর মনে করে না। কারণ ব্যায়াম হিসেবে ইয়োগো চালু হয়ে গেছে। চারপায়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই হাসির ব্যাপার হয়ে যায়। আশ্চর্য।

আখলাক সাহেবের মনে হলো চারপায়ের ব্যাপারটাকে ব্যায়াম হিসেবে চালু করতে পারলে কেউ এটাকে হাস্যকর মনে করবে না। বরং এটাকেই তখন স্বাভাবিক ধরে নেবে। সেই ক্ষেত্রে এই ব্যায়ামের একটা নাম দিতে হয়। কী নাম দেয়া যায়? ফ্রি হ্যান্ড একসারসাইজ বলা যাবে না, হ্যান্ড ফ্রি না। হাত মাটিতে পোতা, ফিক্সড হ্যান্ড একসারসাইজ বলা যেতে পারে। এই ব্যায়ামের উপকারিতা কী তাও লোকজনদের বলতে হবে।

১... শরীরের মাংসপেশি শিথিল হয়। শরীর বিশ্রাম লাভ করে।

২... স্মৃতি-শক্তি ও চিন্তা-শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩... মন প্রফুল্ল হয়।

৪... সুনিদ্রা হয়।

মন প্রফুল্ল হয়। কিনা এ ব্যাপারে আখলাক সাহেব এখনো নিশ্চিত নন। আরো পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তবে সুনিদ্রা যে হয় সে ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত। এই ব্যায়াম তিনি যে কদিন করেছেন ভালো ঘুম হয়েছে। শুধু গতরাতে ঘুম কম হয়েছে। ঘুমে যখন চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে তখন জ্ঞানী ভূত ঘুম থেকে তাকে ডেকে তুলেছে। তিনি বিবক্ত হতে গিয়েও হন নি, কারণ এবার ভূত অনেক দিন পর এসেছে। ভূত কাচুমাচু গলায় বলল, সরি স্যার, আপনার কাচা ঘুম ভাঙ্গালাম।

আখলাক সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, তারপর তোমার খবর কী? অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।

খবর বেশি ভালো না স্যার।

কেন কী হয়েছে?

ডাইরিয়াতে স্যার খুব কষ্ট পেলাম। এখনো পাচ্ছি, পুরোপুরি সারে নি। খাওয়া দাওয়া খুব বেসিট্রিকটেড।

ডাইরিয়া? তোমাদের ডাইনিয়া হয় নাকি?

খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম করলে হয়। সেদিন এক বিয়েতে গিয়ে অনিয়ম হয়েছে। লোভে পড়ে এক গাদা খেয়ে ফেলেছি, তারপরেই পেট নেমে গেছে। ওষুধপত্র খেয়ে এখন কিছুটা আরাম হয়েছে। তবে শরীর খুবই দুর্বল।

কী ওষুধ খাচ্ছ?

ডাইরিয়ার ওষুধ তো একটাই–ওরস্যালাইন।

তোমাদেরও ওরস্যালাইন আছে নাকি?

কী বলেন স্যার, থাকবে না কেন? এক জংশ চাঁদের আলোর সঙ্গে তিন মুঠ গোলাপ ফুলের গন্ধ, তার সঙ্গে হাতের আঙ্গুলের এক চিমটি জোনাকি পোকার আলো। তারপর দে ঘোটা। জিনিস যা তৈরি হয় অতি অখাদ্য। নাড়ি ভূড়ি উল্টে আসে। কী আর করব, শরীরটা তো ঠিক রাখতে হবে।

তাতো বটেই।

এদিকে স্যার বিপদের উপর বিপদ... যাকে বলে মহাবিপদ। ৪ নম্বর দূরবতী বিপদ সংকেত।

কী বিপদ?

বলতেও লজ্জা লাগছে, না বলেও পারছি না।

বলে ফেল।

সত্যি কথা বলতে কী স্যার, এই বিপদে পড়েই আপনার কাছে আসা। আপনার কি স্যার মনে আছে প্রথম যেদিন আপনার কাছে এসেছিলাম সেদিন বলেছিলাম মহাবিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আমি একজন বিপদগ্রস্ত ভূত।

হ্যাঁ মনে আছে।

প্রতিবারই ভাবি বিপদের কথাটা আপনাকে বলব। শেষে নাসিকা লাজায় বলতে লেি ভী।

নাসিকালজ্জা?

মানুষের লজ্জা সবটাই চোখে, এই জন্যে তারা বলে চক্ষুলজ্জা। আমাদের সবটাই নাকে। এই জন্যেই আমরা বলি নাসিকালজ্জা। এমনিতে স্যার আমরা মুখে কথা বলি। লজ্জা পেলে মুখ আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়, তখন কথা বলি নাকে।

ও আচ্ছা। এখন বলো তোমার বিপদের কথাটা শুনি।

বঁড় লঁজ্জা স্যাঁর।

লজ্জা দূর করে বলো–অন্য দিকে তাকিয়ে বলো তাহলে লজ্জা লাগবে না।

ভূত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কথা শুরু করল।

বাড়ি থেকে আমাকে বিয়ের জন্যে খুব প্রেসাব দিচ্ছে স্যার। এদিকে আমার নিজের বিয়ের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। আমি পড়াশোনা, গবেষণা, লেখালেখি নিয়ে থাকি। একটু দেশ ভ্রমণেরও শখ আছে। গত সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঘুরে এলাম। সেখানে কালভৈরবীর মূর্তি দেখে এসেছি। বড়ই আনন্দ পেয়েছি। বিয়ে করলে এইসব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব।

কেন? স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে!

আপনি কি স্যার পাগল হয়েছেন? বাবা-মা যার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন তাকে নিয়ে দেশ বিদেশে ঘোরার প্রশ্নই ওঠে না।

কেন?

তার নাম শুনেলই বুঝবেন কেন, তখন আর আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। তার নাম হলো ফা-চল্লিশ।

ফা-চল্লিশ মানে?

ফা-চল্লিশ মানে চল্লিশ নম্বর ফাজিল।

ফাজিল নাকি?

ফাজিল বলে ফাজিল। রাত দিন গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। একে ভয় দেখায়, তাকে ভয় দেখায়। সেদিন ধানমন্ডি থানার ওসিকে ভয় দেখিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে এইসব করা কি ঠিক? স্যার আপনি বলুন।

পুলিশের সঙ্গে রসিকতা না করাই ভালো।

এটা তো স্যার সাধারণ কথা। যে-কোনো বোকা জানে। সেও জানে, জানে না যে তা না। তবে এই যে বললাম।–ফাজিল।

দেখতে কেমন?

দেখতে ভালো। সর্বনাশ তো এতেই হয়েছে। মা-বাবা ভূতানির রূপ দেখে মুগ্ধ : তাদের এক কথা–বিয়ে ফা-চল্লিশের সঙ্গেই দিতে হবে। স্যার, এখন আপনিই বলুন রূপ বড় না জ্ঞান বড় ঢ় রূপ চিরস্থায়ী না জ্ঞান চিরস্থায়ী? স্যার বলুন, আপনিই বলুন?

দুটা দুজিনিস।

অবশ্যই। একটার সঙ্গে অন্যটার তুলনাই চলে না। আমি বাবা-মাকে বলে দিয়েছিচিরকুমাব থাকব। নো হাংকি পাংকি। বিয়ে-সংসার এইসব আমাকে দিয়ে হবে না। এইজন্যেই স্যার আপনার সাহায্য দরকার।

আমি কীভাবে সাহায্য করব তাতো বুঝতে পারছি না।

আপনি নিজেও তো স্যার চিরকুমার। আপনি আমাকে শলা পরামর্শ দেবেন। কীভাবে আত্মীয়স্বজনদের চাপ কাটানো দেয়া যায় সেটা বলবেন। আমি সেই মতো কাজ করব।

ও আচ্ছা।

শুধু ও আচ্ছা বললে হবে না স্যার। আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে। ফাচল্লিশ যেভাবে বিরক্ত করা শুরু করেছে–অসহ্য। ওফ।

মেয়েটা তোমাকে বিরক্ত করছে?

বিরক্ত মানে মহাবিরক্ত। হয়তো কোনো জ্ঞানের বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি তখন সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে। হাসবে। নানান রকম ঢং করবে। এতে চিন্তার বিঘ্ন হয়।

হওয়ারই কথা।

মনে করুন। আমি কোনো রাস্তা দিয়ে যাব, সে করবে। কী আগে ভাগে সেই রাস্তার কোনো বাঁশ গাছে পা দুলিয়ে বসে থাকবে। পা নাচাবে। উপর থেকে গায়ে থুথু ফেলবে।

আমার মনে হয় মেয়েটা তোমাকে পছন্দ করে।

একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। আমার জীবন অতিষ্ঠা করে তুলেছে। ইচ্ছা হচ্ছে বিষ খাই। এখন আপনি ভরসা। ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে অধমের জীবন রক্ষা করুন।

দেখি কী করা যায়।

তাহলে স্যার আমি আজ যাই। আপনি ঘুমান। অনেকক্ষণ ডিসটার্ব করলাম। নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন স্যার।

ভূত চলে যাবার পরেও অনেক রাত পর্যন্ত আখলাক সাহেব ঘুমাতে পারলেন না। একবার মনে হয় পুরো ব্যাপারটা কল্পনা; আবার মনে হয়–না কল্পনা না, সবই সত্যি। জগৎ খুবই রহস্যময় যে জন্যে মহাকবি শেক্সপিয়র বলেছিলেন–কী যেন বলেছিলেন? মনে পড়েছে না। তিনি অনেকক্ষণ বিছানায় এপোশ ওপাশ করে শেক্সপিয়রের বাণী মনে করার চেষ্টা করলেন। মনে পড়ল না। এই মনে আসছে, এই আসছে না–এমন ভাব। লাইনগুলি মনে না। আসা পর্যন্ত ঘুম আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। কী করা যায়? তাঁর মনে হলো ঘোড়ার মতো চারপায়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মনে পড়বে। একটু লজ্জাও লাগছে। এত লজ্জা করলে জীবন চলে না। তিনি হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বিছানায় বসলেন। চারপায়ে একটু হাঁটলেনও–বিছানাটা হাঁটাহাঁটির জন্যে ছোট হয়ে গেছে। অর্ডার দিয়ে একটা বড় খাট এবং বড় মশারি কিনতে হবে। আখলাক সাহেব অল্প জায়গার ভেতরই একটু চক্কর দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শেক্সপিয়রের বাণী মনে পড়ল–There are many things in heaven and earth... ..বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বহু কিছুই আছে যা মানবের চিন্তা ও কল্পনার অতীত... ..শেক্সপিয়র এইসব জিনিস তো আর গাজা খেয়ে লেখেন নি, জেনে শুনেই লিখেছেন। তাঁর মতো মানুষের গাজা খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

কাজেই ভূতের ব্যাপারটা সত্যি হতেও পারে। চারপায়ে হাঁটার যে সব উপকারিতার কথা ভূত বলেছে তাও সত্যি... স্মৃতিশক্তি যে বাড়ে তা তো তিনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখলেন। অন্যদের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে পারলে ভালো হতো, সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

এ দেশের মানুষ সবকিছু বিশ্বাস করে, যাবতীয় গুজব আগ্রহ নিয়ে শুনে, অন্যকে শোনায়; শুধু ভূতের মতো একটা সত্যি ব্যাপার বিশ্বাস করে না। তারপরেও তিনি ঠিক করলেন– মিলিকে খোলাখুলি ব্যাপারটা বলবেন। মিলিকে বলা আর একটা মাইক ভাড়া করে শহরে ঘোষণা দেয়া এক কথা, তারপরেও বলা দরকার। তবে মিলির স্বামী না শুনলেই ভালো– ব্যাটা অতিরিক্ত চালাবাজ। সব শুনে সে চালবাজি ধরনের কিছু বলবে, মেজাজ হবে খারাপ। কী দরকার।

কলিং বেল টিপতেই তাহের দরজা খুলে দিল। তাহেরের পেছনে উঁকি দিল মিলি, দুজনই সেজেগুজে আছে, মনে হচ্ছে কোথাও বেরুচ্ছে। আখলাক সাহেব বললেন, কোথাও যাচ্ছিস?

মিলি হড়বড় করে বলল, তোমার কাছে যাচ্ছি।

আমার কাছে কেন?

মিলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মোতালেব এসে কী সব উলটা পালটা খবর দিয়ে গেল। চিন্তায় অস্থির হয়ে .

কী বলেছে মোতালেব?

দাদা তুমি নাকি এখন চারপায়ে হাঁটা। তুমি নাকি রাতে ঘুমাও না। মশাবি খাটিয়ে তার ভেতর চারপায়ে দাঁড়িয়ে থােক। মাঝে মাঝে ঘোড়ার মতো চিহি করে ডাক ছাড়।

বলতে বলতে মিলির চোখে পানি এসে গেল। গলা ধরে গেল। তাহের বলল, তুমি ভাইজানকে আগে ভেতরে এসে বসতে দাও। দরজাতেই কী শুরু করলে? মোতালেবের সব কথা বিশ্বাস করতে হবে তার কোনো মানে আছে? ভাইজান আপনি এসে আরাম করে

বসুন তো।

আখলাক সাহেব বসার ঘরের সোফায় এসে বসলেন। তাহের গম্ভীর মুখে তাঁর সামনে এসে বসল। মিলি তার ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এখনো চোখ মুছছে। তাহের বুকে এসে বলল, মোতালেবের কথা সত্যি না, তাই না ভাইজান?

আখলাক সাহেব গলা পরিষ্কার করে বললেন, চিহি করে ডাক দেয়ার ব্যাপারটা সত্যি না। ঐ অংশটা বানানো।

বাকিটা সত্যি?

মোটামুটি সত্যি বলা যেতে পারে।

তাহেরের মুখ হা হয়ে গেল। অনেক কষ্টে সে মুখের হা বন্ধ করে বলল, আপনি তাহলে চারপায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

সব সময় না, মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে?

হ্যাঁ। এটা এক ধরনের একসারসাইজ। এর নাম হলো তোমার ফিক্স হ্যান্ড একসারসাইজ। এই একসারসাইজের অনেক উপকারিতা। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্যে এরচেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।

মিলি চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় বলল, কে শিখিয়েছে তোমাকে এই একসারসাইজ?

কেউ শেখায় নি, নিজে নিজেই বের করেছি।

মিলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, তুমি নিজে নিজে এই একসারসাইজ বের করেছ?

ঠিক নিজে নিজে বলাটা ঠিক হবে না। ভূতেল সাহায্য নিয়েছি।

দাদা, কার সাহায্য নিয়েছ?

ঐ যে একটা ভূত যে আমার কাছে প্রায়ই আসে, নাম হলো গিয়ে— লেখক ৭৪...

মিলি ভীত গলায় বলল, লেখক ৭৪?

ওদের নামকরণ পদ্ধতি আর আমাদের নামকবণ পদ্ধতি এক না। প্রথম দিকে ভুতদের নাম শুনলে একটু ধাক্কা লাগবেই।

মিলি বলল, দাদা তুমি যা বলছ সব কিছুতেই আমার ধাক্কা লাগছে। একী সর্বনাশ হয়ে গেল! বলতে বলতে সে আবারো শব্দ করে কেঁদে উঠল। তাহের বলল, মিলি তুমি রান্নাঘরে যাও তো, ভাইজান এবং আমার জন্যে সুন্দর করে চা বানিয়ে আন। অকারণে অস্থির হয়ে

না। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। বি লেভেল হেডেড। সিচুয়েশন আন্ডার কনট্রোলে আছে। আর শোন, তুমি এখনো ভাইজানের মাথার উপর ফ্যানটা ছাড়ছ না কেন? সব কিছু বলে দিতে হবে? ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দাও।

মিলি ফ্যান ছেড়ে দিল। আখলাক সাহেব গম্ভীর হয়ে সেই ফ্যানের নিচে বসে রইলেন। তিনি খুবই বিরক্ত বোধ করছেন। এই বাড়িতে আসাটা তার জন্যে বোকামি হয়েছে।

তাহের তার দিকে ঝুঁকে এসে প্রায় ফিসফিস করে বলল, ভাইজান একটা কথা বলি?

আখলাক সাহেব বললেন, যা বলতে চাও বলো। ফিসফিস করছ কেন? ফিসফিস করার মতো কিছু কি হয়েছে? যা বলবে স্পষ্ট করে বলবে।

ভাইজান, আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার।

তোমার সে-রকম মনে হচ্ছে?

জি।

তোমার ধারণা আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে?

জি আমার সেরকমই ধারণা। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমার পরিচিত একজন সাইকিয়াট্রিষ্ট আছেন। আমি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাব।

কবে নিয়ে যাবে?

যদি বলেন আজই নিয়ে যাব।

উনাকে আপনার ব্যাপারে সব বলে রেখেছি।

আখলাক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, যদি সত্যি কোনোদিন পাগল হই তাহলে তোমাকে নিয়ে পাগলের ডাক্তারের কাছে যাব। এখন আমার সামনে থেকে যাও। আমাকে বিরক্ত করো না।

আপনি কি একটা রিল্যাক্সেন খেয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকবেন? এতে মাথাটা ঠাণ্ডা হতো।

আমার মাথা নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

জি আচ্ছা।

আখলাক সাহেবের ইচ্ছা হচ্ছে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে। যাচ্ছেন না, কারণ মিলি কষ্ট পাবে। এসেছেন যখন রাতে খেয়ে যেতে হবে। মিলি নিশ্চয়ই কুৎসিত কিছু রান্না করবে। যা মুখে দেয়া যাবে না। রাতে খাবাব সময় আবার বিয়ের প্রসঙ্গ তুলবে। আবারো–৫২। এমন কোনো বয়স না! অসহ্য।

দরজার আড়াল থেকে তৃণা উঁকি দিচ্ছে। তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। সে ফিসফিস করে ডাকল, বড় মামা।

আখলাক সাহেব বললেন, ফিসফিস করছিস কেন?

মা তোমার সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেছে, এই জন্যেই ফিসফিস করছি। মা শুনলে বকা দেবে।

কথা বলতে নিষেধ করেছে কেন?

তোমার যে খুব মেজাজ খারাপ। এই জন্যে।

আমার মেজাজ খারাপ না। আয় কাছে আয়।

তৃণা এগিয়ে এলো এবং কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, বড় মামা তুমি নাকি পাগল হয়ে গেছ?

আখলাক সাহেব বললেন, কে বলেছে?

বাবা বলেছে। মা সেটা শুনে সারা দুপুর কেঁদেছে। বড় মামা, তুমি কি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছ, না একটু বাকি আছে?

একটু বাকি আছে।

মোতালেব বলছিল তুমি নাকি এখন ঘোড়ার মতো হাঁট আর চিহি করে ডাক দাও।

ও একটু বেশি বেশি বলছে। চিহি করে ডাক দিই না।

যখন চিঁহি করে ডাক দেবে তখন পুরোপুরি পাগল হয়ে যাবে, তাই না মামা?

হুঁ।

ঐ ভূতটা কি তোমাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছে মামা?

বুঝতে পারছি না, বোধহয় দিচ্ছে।

মিলি অনেক কিছু রান্না করেছে। পাবদা মাছ, কাতলা মাছের মাথার মুড়িঘণ্ট। কই মাছের ঝোল। ইলিশ মাছের সর্ষে বাটা। প্রতিটি পদই হয়েছে অখাদ্য। শুধু শুধু যে ভাত খাবেন সে উপায়ও নেই। চাল কিছু সেদ্ধ হয়েছে, কিছু হয় নি। একই হাঁড়ির ভাত অর্ধেক সেদ্ধ হয়, অর্ধেক হয় না কেন তা বোধহয় শুধু মিলিই জানে।

৬. আখলাক সাহেব বাড়ি ফিরলেন

আখলাক সাহেব রাত এগারোটার দিকে বাড়ি ফিরলেন। মোতালেবকে বললেন, চা করতে। মোতালেব চা বানিয়ে আনল। চায়ের কাপটা তাঁর সামনে বাখল। খুব ভয়ে ভযে। যেন তিনি ভয়ঙ্কব কোনো হিংস্র জানোয়ার, এক্ষুনি মোতালেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সে তার সামনেও আসছে না। দরজার আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে। চোখের উপর চোখ পড়া মাত্র চোখ সবিয়ে নিচ্ছে। আখলাক সাহেব শীতল গলায় ডাকলেন, মোতালেব!

মোতালেব চমকে উঠে বলল, জ্বে খালুজান।

তুই আমার প্রতিটি কথায় চমকে চমকে উঠছিস কেন? কী হয়েছে?

কিছু হয় নাই খালুজান।

তুই কি আমাকে ভয় পাচ্ছিস?

অল্প অল্প পাইতেছি খালুজান।

ভয় পাচ্ছিস কেন?

মোতালেব কিছু না বলে মাথা চুলকাতে লাগল। আখলাক সাহেব বললেন, আচ্ছা যা, শুধু শুধু মাথা চুলকাতে হবে না। ঘুমাতে যা।

মোতালেবেব মাথা চুলকানো আরো বেড়ে গেল। আখলাক সাহেব বললেন, আর কিছু বলবি?

একটু দেশে যাব।

হঠাৎ দেশে যাবি কেন?

আমার পিতার শইল খুব খারাপ। মিত্যু ছজ্জায়।

কার শরীর খারাপ?

আমার পিতা, আকবাজান।

আখলাক সাহেবের মেজাজ খুব খারাপ হলো, কারণ মোতালেবের বাবা গত বৎসর মারা গেছেন। এই খবর আখলাক সাহেব ভালোমতোই জানেন। মিথ্যা কথা বলে মোতালেব ছুটি নিচ্ছে কেন?

তোর বাবা মৃত্যুশয্যায়?

জ্বে।

গত বৎসর যিনি মারা গেলেন। তিনি কে?

মোতালেব থাতমত খেয়ে বলল, আমার পিতা। এখন যার অসুখ হইছে সে আমার পিতার মতোই। আমার গেরাম সম্পর্কে চাচা। আমারে বড়ই ছেনেহ করে।

আখলাক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, যিনি ছেনেহ করেন, তার অসুখের খবরে ছুটে যাওয়া উচিত। আসবি কবে?

এইটা অসুখের উপরে নির্ভর।

আচ্ছা যা। কাল দিনটা থাক, বাজার টাজার যা দরকার করে দিয়ে চলে যা।

জ্বে আইচ্ছা।

মেজাজ টেজাজ খারাপ করে আখলাক সাহেব ঘুমাতে গেলেন। মিলির বাসা থেকে ফেরার সময় মেজাজ যত খারাপ ছিল, এখন তারচে পাঁচগুণ খারাপ। এই অবস্থায় ঘুম আসার কথা না। আখলাক সাহেব মশারি ফেলে বিছানায় বসে রইলেন। তিনি আসলে মনে মনে ভূতের জন্যে অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা করলে কেউ আসে না। যে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করা হয়, সেই ট্রেন আসে তিন ঘণ্টা লেট করে। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে তিনি যখন ঘুমুতে গেলেন তখনই ভূত এসে উপস্থিত। মশারির পাশে দাঁড়িয়ে সে খুকধুক করে দৃষ্টি আকর্ষণ জাতীয় কাশি কাশতে লাগল। আখলাক সাহেব বললেন, কে?

স্যার আমি। আপনার কি শরীর টরির খারাপ নাকি? গলা কেমন ভারী ভারী শুনাচ্ছে।

শরীর ঠিকই আছে, মনটা খারাপ।

মন খারাপ কেন স্যার?

আছে নানান ব্যাপার, মোতালেব আমার নামে আজেবাজে কথা ছড়াচ্ছে। মিথ্যা কথা বলে আবার ছুটি নিয়ে নিল।

মন কি বেশি খারাপ?

হুঁ।

আমার নিজেরো স্যার মন অতিবিক্ত খারাপ। ফা-৪০ আমার নামেও আজেবাজে জিনিস ছড়াচ্ছে। যে জন্যে গতকাল সারা রাত পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে ছিলাম। তারপর মনটা ঠিক হয়েছে।

আখলাক সাহেব উৎসাহিত গলায় বললেন, এরকম করলে মন ঠিক হয় নাকি?

জি হয়। ব্যাপারটা পরীক্ষিত। ব্যাখ্যা করলে আপনি বুঝতে পারবেন। ব্যাখ্যা করব?

কর।

ধরুন আপনি পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে রইলেন। পানিটা ঠাণ্ডা। এতে হবে কী আপনার শরীরের তাপ কমে যাবে, সেই তুলনায় মাথার তাপ থাকবে বেশি; ফলে একটা তাপ পার্থক্য তৈরি হবে। তাপ পার্থক্যের কারণে তৈরি হয় বিভব পার্থক্য বা জাংশন পটেনশিয়াল। তখন মাথা থেকে শরীরে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে। এক ধরনের বায়োকারেন্ট। তার ফলে মাথার উপর জমে থাকা চাপ কমে যায়।

তাই নাকি?

খুব মন টন খারাপ হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন স্যার।

দেখি।

আপনার বাসায় তো চৌবাচ্চা আছে। পানি দিয়ে চৌবাচ্চা ভর্তি করে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকবেন। সকালে বসবেন সন্ধ্যাবেলা উঠবেন। দেখবেন মন পাখির পালকের মতো ফুরফুরে হয়ে যাবে। ফা-৪০ যখনই ঝামেলা করে তখনই আমি এই পদ্ধতি ব্যবহার করি। খুব ফলদায়ক পদ্ধতি।

মেয়েটা কি ঝামেলা করছে?

অতিরিক্ত ঝামেলা করছে। এখন আবার আমাকে দেখলে গান গায়।

বলো কী?

দারুণ লজ্জার মধ্যে পড়েছি। ভূত সমাজে আমাকে নিয়ে খুব হাসোহাসি।

গান গায় কেমন?

ভালো গায়। এটা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। অডিসনে পাশ করে রেডিওতে চান্স পয়েছে। আখলাক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমাদের রেডিও আছে নাকি?

রেডিও টিভি সবই আছে। ভূত বলে আমাদের ছোট চোখে দেখবেন না স্যার।

না তা দেখছি না।

আমি আজ চলে যাই স্যার। কয়েকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। ফা-৪০ এর হাত থেকে বাঁচার জন্যে কয়েকদিন দূরে কোথাও লুকিয়ে থাকব।

ভূত চলে গেল। আখলাক সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল। সারা রাত আর ঘুম হলো না। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে রইলেন। মন বেশি খারাপ। খারাপ ভাবটা যাচ্ছেই না।

আখলাক সাহেব ভোরবেলা নাস্তা খেয়ে চৌবাচ্চায় পানি ভর্তি করালেন। ভূতের চিকিৎসাটা করে দেখা দরকার। মন খারাপ ভাবটা যদি এতে যায়। তিনি দুপুর পর্যন্ত গলা ডুবিয়ে বসে রইলেন। দুপুরবেলা মোতালেব গিয়ে মিলি এবং তাহেরকে ডেকে নিয়ে এলো।

মিলি ভীত গলায় বলল, দাদা কী হচ্ছে?

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বলল, কী হচ্ছে তাতো দেখতেই পাচ্ছিস?

তুমি পানিতে গলা ডুবিয়ে বসে আছ কেন?

মন টন খারাপ, এই জন্যে বসে আছি।

মন খারাপ হলে পানিতে বসে থাকতে হয়?

হ্যাঁ হয়। তুই কাঁদছিস কেন?

তুমি পানিতে বসে আছ। এই জন্যে কাঁদছি। একা একা থেকে তোমার এই অবস্থা মুন্ন দাদা। কতবার বলেছি একটা বিয়ে কর। আমার কথা তো কানে নেবে না। প্লিজ উঠে আস।

তাহেরও শুকনো মুখে বলল, ভাইজান দয়া করে পানি থেকে উঠে আসুন। আজ সন্ধ্যায়। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব। এপয়েন্টমেন্ট করে রেখেলি আখলাক সাহেব বললেন, সন্ধ্যান্য নিয়ে যাবে সন্ধ্যায় উঠব। এখন উঠার দরকার কী? মিলি এমন কান্নাকাটি শুরু করল যে আখলাক সাহেবকে বাধ্য হয়ে পানি থেকে উঠতে হলো।

৭. সাইকিয়াট্রিস্টের নাম জয়েনউদ্দিন

সাইকিয়াট্রিস্টের নাম জয়েনউদ্দিন। আখলাক সাহেব এত বেঁটে মানুষ তাঁর জীবনে দেখেন নি। ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন। টেবিলের উপর দিয়ে তাঁর চোখ দুটি শুধু বের হয়ে আছে। পাশাল পাগল ধরনের চোখ। ভদ্রলোক বসে আছেন একটা রোলিং চেয়ারে। স্থির হয়ে বসে নেই, সারাক্ষণ এদিক ওদিক করছে। চিড়িয়াখানার পশুদের যারা দেখাশোনা করে তাদের চেহারা এবং স্বভাব চরিত্র খানিকটা চিড়িয়াখানার পশুদের মতো হয়ে যায়। মিরপুর চিড়িয়াখানায় যে লোকটা জিরাফের দেখাশোনা করে তার গলাটা প্রতিবছর কিছুটা করে লম্বা হয়। সাইকিয়াট্রিক্টরা পাগলের চিকিৎসা করেন, কাজেই তাদের হাব ভাব পাগলদের মতোই হবে বলাই বাহুল্য। আখলাক সাহেব বেশ কৌতূহল নিয়ে সাইকিয়াট্রিক্ট জালালউদিনের চেয়ারে নড়াচড়া দেখছেন। ভদ্রলোক যেমন স্থির হয়ে বসতে পারেন না তেমনি স্থির চোখে তাকাতেও পারেন না। মনে হয় দুটা মাত্র চোখ থাকায় তার খুব অসুবিধা হচ্ছে। গোটা চারেক চোখ থাকলে সুবিধা হতো। আরাম করে এক সঙ্গে চারদিক দেখতে পারতেন।

তাহের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, জালাল সাহেব আমি পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার স্ত্রী বা বড়ভাই, নাম আখলাক হোসেন। অধ্যাপনা করেন। আপনাকে তার কথা বলেছিলাম।

জালাল সাহেব হাসি মুখে বললেন, ও আচ্ছা আচ্ছা। বলেছিলেন তো বটেই। উনার কাছেই একটা ভূত আসে। গল্প গুজব করে। তাই না? ভূতের নাম লেখক সাতচল্লিশ।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, সাতচল্লিশ না চুয়াত্তুর।

ও আচ্ছা, আমার আবার সংখ্যা মনে থাকে না। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। আরাম করে বসুন। আজ অবশ্যি আমার হাতে সময় খুব কম। আমার মেয়ের জন্মদিন। এখান থেকে সরাসরি গুলশানে একটা খেলনার দোকানে যাব। খেলনা কিনব। কী কিনব ভেবে পাচ্ছি না। গত আধা ঘণ্টা ধরে শুধু তাই ভাবছি। তার পছন্দের খেলনা হচ্ছে বারবি ডল। গোটা বিশেক তার আছে বলে আমার ধারণা। আরো গোটা বিশেক পেলেও শখ মিটবে না। বারবি ডলই আজ আরেকটা কিনব। যাহা বাহান্ন তাহা একাশি।

আখলাক সাহেব বসলেন। সাইকিয়াট্রিস্টের মাথা যে পুরোপুরি খারাপ তা বোঝাই যাচ্ছে। অকারণে এতগুলি কথা বলল। যাহা বাহান্ন তাহা একাশি আবার কী?

সাইকিয়াট্রিক্ট আখলাক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার ভূতের ব্যাপারটা কী পরিষ্কার করে বলুন তো। কিছুই বাদ দেবেন না। তবে সংক্ষেপ করে বলবেন। হাতে একদম সময় নেই। আজ আমার মেয়ের জন্মদিন। একটা খেলনা কিনতে হবে। বারবি ডল।

আখলাক সাহেব চুপ করে রইলেন। লোকটার সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। যে লোক সারাক্ষণ এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, এক মিনিটের মধ্যে দুবার মেয়ের জন্মদিনের কথা বলছে তার সঙ্গে কথা বলবেন কী?

ভূতটা কি রোজ। আপনার কাছে আসে?

মাঝে মাঝে আসে।

দেখতে কেমন?

দেখতে ভূতের মতো।

সেই ভূতের মতোটাই কেমন? লম্বা, না বেঁটে। কালো না সাদা? বড় বড় দাঁত না ছোট ছোট দাতা? মাথায় চুল আছে না। টাক মাথা?

জানি না।

জানেন না কেন? আপনি কি তাকে দেখেন নি?

জি না। অন্ধকারে সে আসে। অন্ধকারে তাকে দেখব কীভাবে? আমি তো বিড়াল না। যে অন্ধকারে দেখব।

তাতো ঠিকই। আচ্ছা ভূতটা সম্পর্কে কিছু বলুন তো।

কী বলব?

তার স্বভাব চরিত্র। তার আচার-আচরণ। সে বোকা না বুদ্ধিমান–এইসব আর কী? আপনার কি ধারণা সে বুদ্ধিমান?

সে যথেষ্টই বুদ্ধিমান।

আপনার চেয়েও বুদ্ধিমান?

সেটা বুঝব কী করে?

সহজেই বোঝা যায়। যেমন ধরুন। একটা ধাঁধা আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো। আপনি সেটা পারলেন না। কিন্তু ভূতকে জিজ্ঞেস করা মাত্র সে পারল। তখন বুঝতে হবে ভূতটা বুদ্ধিমান।

আমি ভুতকে কখনো কোনো ধাঁধা জিজ্ঞেস করি নি।

পরের বার যখন দেখা হবে, দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন। এমন একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করবেন যার উত্তর আপনার জানা নেই।

উত্তর জানা নেই এরকম ধাঁধা। আমি নিজেও জানি না। আমি যে সব ধাঁধা জানি তার উত্তরও জানি।

আমি আপনাকে একটা ধাঁধা শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার ধারণা এই ধাঁধার উত্তর আপনি জানেন না।

বাঘের মতো লাফ দেয়
কুকুবেব মতো বসে।
লোহার মতো জলে ডুবে
শোলার মতো ভাসে।

অর্থাৎ অদ্ভুত একটা জিনিস যে বসে কুকুরের মতো, কিন্তু লাফ দেয় বাঘের মত। পানিতে লোহার মতো টুপ করে ডুবে যায়, আবার শোলার মতো অবলীলায় ভাসে। আপনি কি জানেন জিনিসটা কী?

জি না।

তাহের সাহেব, আপনি জানেন?

জি না।

সাইকিয়াট্রিক্ট হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে কঠিন একটা ধাঁধা দিতে পেরে তিনি আনন্দিত। আখলাক সাহেবের মনে হলো তার আগে এই ভদ্রলোকের চিকিৎসা হওয়া উচিত।

আখলাক সাহেব।

জি।

আপনার ভূতের ব্যাপার সবটাই আমি জানি। তাহের সাহেব আমাকে খুব গুছিয়ে সব বলেছেন। তবু আপনার মুখ থেকে শোনা দরকার। এত লোক থাকতে ভূতটা আপনার কাছে আসে। কেন বলুন তো?

ও একটা সমস্যায় পড়েছে। সমস্যার সমাধানের জন্যে আমার কাছে আছে।

সমস্যাটা কী?

ওর বাবা-মা ওকে বিয়ে দিতে চাচ্ছে, ও বিয়ে করতে চাচ্ছে না। ও ঠিক করেছে চিরকুমার থাকবে।

আমি যতদূর জানি আপনারও একই সমস্যা, তাই না? আপনার আত্মীয়স্বজন আপনাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছে, আপনি রাজি না। আপনিও ঠিক করেছেন চিরকুমার থাকবেন। ঠিক তো?

আখলাক সাহেব চুপ করে রইলেন। সাইকিয়াট্রিক্ট বললেন, আপনার সমস্যা খুব সহজ সমস্যা। আপনার অবচেতন মনের চিন্তা-ভাবনাই ভূত হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে। অন্য কিছু না। সময় থাকলে আরো পরিষ্কার করে আপনাকে বুঝিয়ে দিতাম। আজ আমার একটু কাজ আছে, আপনাকে বেশি সময় দিতে পারছি না। আজ আমার মেয়ের জন্মদিন। না গেলেই না। সাতটার সময় যাওয়ার কথা ছিল। আটটা বেজে গেছে। আমাকে একটা খেলনার দোকানে যেতে হবে। খেলনা কিনতে হবে। আর দেরি করা যাবে না। আখলাক সাহেব, আপনি পরেরবার আসবেন। আপনার ভূত সমস্যার সমাধান করে দেব। ভালো কথা ধাঁধার উত্তর ভূতের কাছ থেকে নিয়ে আসবেন।

আখলাক সাহেব বললেন, জি আচ্ছা। তার মাথার মধ্যে ধাঁধা ঘুরতে লাগল।

বাঘের মতো লাফ দেয়
কুকুবেব মতো বসে।
লোহার মতো জলে ডুবে

শোলার মতো ভাসে।

আশ্চর্য তো! জিনিসটা কী?

সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বার থেকে বের হয়ে তাহের বলল, ভাই সাহেব, আপনি দয়া করে আজ রাতটা আমার বাসায় থাকুন। আখলাক সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, কেন?

আপনার বাসায় কাজের লোক নেই। মোতালেব চলে গেছে, রান্না বান্না...

এইসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

তারচেয়ে বড় কথা ভূতটা আবারো আপনাকে বিরক্ত করবে। আপনার এখন বিশ্রাম দরকার। ঘুম দরকার। ভূতটা তো আর আমার বাসা চেনে না। আমার বাসায় থাকলে সে আর আপনাকে বিরক্ত করতে পারবে না। ওর সঙ্গে তাহলে আর আপনার দেখা হবে না। আপনার ঘুমে ডিসটর্ব করতে পারবে না।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, বোকার মতো কথা বলো না তো তাহের। ভূতটার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার বিশেষ দরকার। ওকে ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞেস করতে হবে। তা ছাড়া সে দেখতে কেমন তাও জানি না। দেখা দরকার।

আখলাক সাহেব রাতে খাওয়া দাওয়ার পর শুয়েছেন। নিজে কিছু রাধেন নি। হোটেল থেকে খাবার নিয়ে এসেছেন। অতি অখাদ্য খাবার। মনে হচ্ছে ফুড পয়জনিং হয়ে যাবে।

আখলাক সাহেব ভূতের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ভূত আসছে না। ঝুম বৃষ্টি শুরু হলো। আখলাক সাহেব চিন্তিত বোধ করছেন। ঝড় বৃষ্টিতে ভূতরা আসে কি না তা তিনি জানেন না। বৃষ্টিতে তাদের কি অসুবিধা হয়? তাদের কি ছাতা আছে? অনেক কিছুই তিনি তাদের সম্পর্কে জানেন না। ভূত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ভূত-এনসাক্লোপিডিয়া জাতীয় একটা বই থাকা দরকার ছিল। বৃষ্টির শব্দে তাঁর ঘুম এসে যাচ্ছে। চোখ মেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

স্যার জেগে আছেন?

আখলাক সাহেব পোশ ফিরলেন। ভূতের কথা শুনে তাঁর ভালো লাগছে। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর চোখ থেকে ঘুম চলে গেল।

স্যারের কাচা ঘুম ভাঙলাম না তো?

না, আমি জেগেই ছিলাম। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

শুনে বড় ভালো লাগল স্যার। আপনার কোনো খেদমত কি করতে পারি?

প্রথমে একটা ধাঁধার জবাব দাও, নয় তো কথায় কথায় ভুলে যেতে পারি। ধাঁধাটা হচ্ছে–

বাঘের মতো লাফ দেয়
কুকুবেব মতো বসে।
লোহার মতো জলে ডুবে

শোলার মতো ভাসে।

এটা স্যার ব্যাঙ। ব্যাঙ বসে ঠিক কুকুরের মতো। লাফ দেয় বাঘের মত। পানিতে ডুবতে পারে আবার ভাসতেও পারে। ধাঁধা জিজ্ঞেস করছেন কেন স্যার?

আছে একটা ব্যাপার।

আমাকে বলা যাবে না?

এক ভদ্রলোক আমাকে ধাঁধাটা জিজ্ঞেস করেছিল, আমি উত্তর দিতে পারি নি।

এতে কি স্যার আপনার মন খারাপ হয়েছে?

একটু হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে আমার বুদ্ধি ভূতদের চেয়ে কম।

সব ভূতের চেয়ে কম না। স্যার, কিছু কিছু ভূতের চেয়ে কম। যেমন ধরুন আমার চেয়ে কম। তাতে লজ্জা বা অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই। ভূতদের মধ্যে আমার জ্ঞান বেশি। আবার মহামুর্খ ভূতও আছে।

তোমাদের মধ্যে পাগল নেই?

পাগল?

হ্যাঁ পাগল। মানুষের মধ্যে যেমন পাগল আছে, পাগলের ডাক্তার আছে, তোমাদের মধ্যে সেরকম কিছু নেই?

আছে। মানুষের সঙ্গে আমাদের তেমন কোনো বেশিকম নেই। আপনারা যেমন কারো উপর রেগে গেলে বলেন, ব্যাটা ভূত, আমরাও তেমনি কোনো ভূতের উপর রেগে গেলে বলি, ব্যাটা মানুষ।

তাই নাকি?

জি স্যার। এ ছাড়াও আরো মিল আছে–যখন আপনারা খুব ব্যস্ত থাকেন তখন বলেন–হাতে সময় নেই। আমরা বলি–পায়ে সময় নেই।

আশ্চর্য তো।

আশ্চর্য হবার কিছুই নেই স্যার। ভূত ও মানুষ এক সুতায় গাঁথা। এই জন্যেই মহাকবি-ক–৫০০০০০০০ বলেছেন—

ভূ মা
এ মা–

আখলাক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এর মানে কী?

ভু মা মানে হচ্ছে–ভূত ও মানুষ। এ ম মানে হচ্ছে–এক সুতায় গাঁথা মালা। অসাধারণ একটা কবিতা না স্যার?

বুঝতে পারছি না। আমি আবার কবিতা ভালো বুঝি না।

আখলাক সাহেব বললেন, আরেকটা কী যেন কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। এখন মনে পড়ছে না।

চারপায়ে একটু হাঁটাহাঁটি করুন, মনে পড়বে।

ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। ভূত মেয়েটার খবর কী? ফা-৪০।

ওর কথা মনে করিয়ে মেজাজটা খারাপ করে দিলেন। আমার জীবন সে অতিষ্ঠা করে তুলেছে। মহাকবি ক–৫০০০০০০০ এর ভাষায়,

জী য়
জী ময়–

মানে কী?

মানে হচ্ছে— জীবন দুঃখময়, জীবন মহাদুঃখময়। ফা-৪০ এখন সারা আমার পিছ ছাড়ছে না। এই যে আমি আপনার কাছে এসেছি সেও এসেছে। জানালার ওপাশে পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের প্রতিটি কথা শুনছে। স্যার, যাকে বলে মহাসমস্যা। আপনি কি তার সঙ্গে একটু কথা বলবেন?

আমি কী বলব?

একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবেন। ওকে ভেতরে আসতে বলব স্যার?

বলো।

না, আপনিই বলুন। আমার ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। ফা-৪০ বলে ডাক দিন চলে আসবে।

ওকে কী বলব সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

আমাকে যেন মুক্তি দেয় এইটুকু বলবেন। এর বেশি কিছু আমি চাই না। আমার জীবন রক্ষা করুন স্যার। আমি চিরঋণী হয়ে থাকব। আমি স্যার এখন চলে যাচ্ছি। ওর সঙ্গে এক ঘরে থাকা আমার সম্ভব না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আমি মরে যাব। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই সার। এই মেয়ে কিন্তু মহাবুদ্ধিমতী। যুক্তিতে তার সঙ্গে পারা কঠিন। তার সঙ্গে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলতে হবে।

আখলাক সাহেব ডাকলেন, ফা-৪০।।

জানালার পর্দা একটু কঁপিল। আখলাক সাহেবের মনে হলো তীর মশারির পাশে কে যেন এসে বসল। তাঁর মেজাজ এখন কিছুটা খারাপ, এ-কী যন্ত্রণা! তাঁর নিজের সমস্যারই কুল কিনারা নেই। তাঁকে দেখতে হচ্ছে ভূতদের সমস্যা।

তুমি কি ফা-৪০?

আমি ফা-৪০ হব কেন? আমার নাম হ্রিহ্রিলা। ফা-৪০ কারো নাম হয়?

তবে যে আমি শুনলাম..

ওর কাছে যা শুনেছেন সবই ভুল শুনেছেন। ওর মাথাটা হয়ে গেছে খারাপ। নিজের মাথা তো খারাপ হয়েছেই, অন্যের মাথাও খারাপ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। আপনারটাও প্রায় খারাপ করে এনেছে।

আমারটাও খারাপ করে এনেছে?

অবশ্যই। চারপায়ে হাঁটাহঁটি করছেন। এটা মাথা খারাপের লক্ষণ না? আপনি কি গরু না ছাগল যে চারপায়ে হাঁটবেন? ডাবউইনের থিওরি তো আপনি পড়েছেন, পড়েন নি?

আখলাক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তেমনভাবে পড়ি নি। তবে মোটামুটি জানি।

মোটামুটি জানলে তো আপনার জানা থাকব কথা–প্রাণী বিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষ এসেছে। তার পূর্বপুরুষ এক সময় চারপায়ে হাঁটত। আপনি সেখানেই ফিরে যাচ্ছেন। এটা একটা লজাব কথা না?

আখলাক সাহেব দারুণ অস্বস্তি নিয়ে খুকগুক করে কাশতে লাগলেন। হ্রিহ্রিলা মেয়েটি তো আসলেই জটিল। ওব সঙ্গে আরো সাবধানে কথা বলতে হবে। হ্রিহ্রিলা বলল, ও কেমন পাগল সেটা কি স্যার আপনি দয়া করে একটু শুনবেন?

বলো।

রোজ সে আপনার কাছে আসছে। আপনাকে বিরক্ত করছে। আবার ওদিকে একটা বই লিখছে, যে বইয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে–মানুষ বলে কিছু নেই, মানুষ হলো ভূতের মাথার দgন্ম!

বলো কী!

যা সত্যি সেটাই স্যার আপনাকে বলছি।

আখলাক সাহেব রীতিমত ধাঁধায় পড়ে গেলেন। কী বলবেন কিছু বুঝতে পারলেন না। হ্রিহ্রিলা বলল, ওর মাথায় স্যার পদার্থ বলে এখন কিছুই নেই। আপনাকে নিয়ে সবাই যেমন হাসাহাসি করে, ওকে নিয়েও করে। আমার এমন কষ্ট হয়!

আখলাক সাহেব বললেন, তুমি একটু ভুল বলেছ হ্রিহ্রিলা, আমাকে নিয়ে কেউ হাসাহসি করে না।

অবশ্যই আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কলেজ থেকে আপনাকে ছুটি দিয়েছে। আপনাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। নিয়ে যায় নি?

হুঁ।

আপনাকে নিয়ে শুধু যে হাসাহাসি করে তাই না, আপনাকে ভয়ও করে।

ভয় করে?

অবশ্যই ভয় করে।

আপনার কাজের ছেলে মোতালেব আপনাকে ছেড়ে চলে গেল কেন? আপনাকে ভয় পাচ্ছে বলেই চলে গেছে।

হুঁ।

এখন আপনার যারা অতি কাছের তারা আপনাকে ভয় পাচ্ছে। কিছুদিন পরে দেখা যাবে সবাই ভয় পাবে। ভয় হচ্ছে সংক্রামক। সবাই আপনাকে ভয় পেতে শুরু কবলে আপনিও সবাইকে ভয় পেতে থাকবেন।

হুঁ।

আপনার স্যার মহাদুঃসময়।

হুঁ।

আপনার এখন কী করা উচিত তা কি স্যার জানেন?

না।

প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।ভোভোহাম্বর কাছ থেকে দূরে থাকা।

ভোভোহা কে?

যাকে আপনি লেখক-৭৪ নামে চেনেন সে-ই হলো ভোভোহা। এটাই তার আসল নাম। ভূতদের নামকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে সে যা বলেছে সবই বানানো। তার উর্বর মাথার কল্পনা। আমার নাম দিয়েছেন ফা-৪০, ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা।

আখলাক সাহেব কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মাথা চুলকাতে লাগলেন। মেয়েটাকে তার পছন্দ হচ্ছে। ভূত হলেও চমৎকার মেয়ে। ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে।

স্যার।

হুঁ।

আপনাদের শহরের ট্রাকের পেছনে যেমন লেখা থাকে–১০০ গজ দূরে থাকুন। আপনিও অবশ্যই ভেভোহার কাছ থেকে ১০০ গজ দূরে থাকবেন। নয় তো আপনার ভয়াবহ বিপদ।

দূরে থাকব কী করে? রাত হলেই তো সে চলে আসবে।

সেই সমস্যার সমাধানও স্যার আছে।

বলো, কী সমাধান।

আমার সমাধান কি আপনি শুনবেন? আমি আপনার কে?

আখলাক সাহেব বললেন, তুমি আমার মেয়ের মতো। বলে নিজেই লজ্জায় পড়ে গেলেন। ভূতকে তিনি বলছেন, তুমি আমার মেয়ের মতো। তাঁর মাথা তো আসলেই খারাপ হয়ে গেছে। হ্রিহ্রিলা গাঢ় গলায় বলল, মেয়ে যখন বলেছেন তখন আপনার মঙ্গল দেখার দায়িত্ব আমার। চাচাজান, আপনি আমার কথা শুনুন। আপনার ভূত মেয়ের কথা আপনাকে শুনতেই হবে।

আখলাক সাহেব বললেন, বিলো মা কী কথা।

এটা বলে তিনি আবারো চমকালেন। একটা ভূত মেয়েকে তিনি মা ডাকছেন, কী আশ্চর্য কথা।

চাচাজান।

হুঁ।

আপনি একটা বিয়ে করুন চাচাজান।

সে কী?

সে কী ফোকী বললে চলবে না। আপনার বোন মিলি যে মহিলার কথা বলছে তাকে আমি দেখেছি–অতি ভালো একজন মহিলা... তাকে বিয়ে করলে আপনি খুব সুখী হবেন।

আখলাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, এইসব ফালতু কথা বন্ধ করা তো।

ফালতু কথা আমি বন্ধ করব না। আপনি রাজি না হলে আমি কিন্তু কাঁদতে শুরু করব। ভূত মেয়েব কান্না সামলানো খুব কঠিন। আমরা মানুষ মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি কাঁদতে পাবি।

এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল।

হ্রিহ্রিলা হাসতে হাসতে বলল, ভূত কন্যাকে মেয়ে ডেকেছেন, যন্ত্রণা তো হবেই।

আখলাক সাহেব পিঁড়িবিড় করে বললেন, ভোভোহার সমস্যা মিটাতে গিয়ে নিজে কী সমস্যায় পড়ে গেলাম।

ওব সমস্যা নিয়ে আপনাকে মোটেই ভাবতে হবে না। আপনার সমস্যা যেমন আমি দেখব, ওরটাও আমি দেখব।

এই বয়সে বিয়ে, লোকে বলবে কী?

বলুক যার যা ইচ্ছা। সারাটা জীবন একা একা কাটাবেন? আপনি সারাজীবন অনেক কষ্ট করেছেন। আর আপনাকে কষ্ট করতে দেব না।

আখলাক সাহেব হ্রিহ্রিলার কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। ভূত মেয়ে কিন্তু কাঁদছে। ঠিক মানুষের মেয়ের মতো। কান্না শুনে তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তিনি গাঢ় গলায় বললেন, কাঁদিস না তো মা। হ্রিহ্রিলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আরো কাঁদব। চিৎকার করে কাঁদব।

৮. আখলাক সাহেবের বিয়ে হলো

বৈশাখ মাসের বার তারিখ আখলাক সাহেবের বিয়ে হলো। বেশ ধুমধাম করে বিয়ে। আখলাক সাহেবের কঠিন নিষেধ সত্ত্বেও মিলি কার্ড ছাপিয়ে মহা উৎসাহে সবাইকে বিলি করল। আখলাক সাহেবের লজ্জার সীমা রইল না। তবে একটা কার্ডে তিনি হ্রিহ্রিলা ও ভোভোঁহার নাম লিখে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে টেবিলের উপর রেখে দিলেন। সকালে উঠে সেই কার্ড আর দেখলেন না।

আখলাক সাহেবের ধারণা ওরা বউ-ভাতেও এসেছিল। তের তারিখ রাতে সোহাগ কমিউনিটি সেন্টারে বউ-ভাত হলো। যখন সবাই খাওয়া দাওয়া করছে তখন হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। সারা শহরে ইলেকট্রিসিটি আছে শুধু কমিউনিটি সেন্টারে নেই। ওদের নিজস্ব জেনারেটর আছে। অনেক চেষ্টা করেও সেই জেনারেটর চালু করা গেল না। মিনিট দশেক পর আপনা-আপনি সব বাতি জ্বলে উঠল।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, আখলাক সাহেবের একটি মেয়ে হয়েছে। সেই মেয়েও বড় হয়েছে, এখন সে অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাশ থ্রিতে পড়ে। মেয়েকে আখলাক সাহেব অসম্ভব আদর করেন। মাঝে মধ্যে বিচিত্র একটা নামে তিনি মেয়েকে ডাকেন। সেই নামটা হলো–হ্রিহ্রিলা। কলেজ থেকে ফিরে মধুর গলায় ডাকবেন, আমার হ্রিহ্রিলা মা কই গো?

আখলাক সাহেবের স্ত্রী খুব রাগ করেন। এত সুন্দর সুন্দর নাম থাকতে পরীর মতো রূপবতী মেয়েকে কেউ হ্রিহ্রিলা ডাকে? নিজের মেয়েকে আদর করার সময় ভূত মেয়ের কথাও তার মনে পড়ে যায়। সেই মেয়েকেও তার খুব আদর করতে ইচ্ছা করে।